রামাদের দেশে
সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ২০০৮

Date of first edition publication: April, 2008

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Published by Sayed Hossain (writer)

Contact Address:

Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya,
Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

©Sayed Hossain 2008

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

ISBN No. 978-983-43934-2-7

** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

© Ramader Deshe, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

রামাদের দেশে

*****

সাইদ হোসেন

॥ ১ ॥

Land of Smiles

সূবর্ণভুমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট । বছর খানেক হলো এটা করা হয়েছে । দূর থেকে মনে হয় একটা নগরী জ্বলজ্বল্ করে জ্বলছে । এই এয়ারপোর্টের দৈর্ঘ্য আর প্রস্ত এতটাই সু-প্রসস্থ যে, ঠিক কতটা জায়গা জুড়ে আছে, তা অনুমান করা যায় না । ব্যাংককের মূল শহর থেকে এক ঘন্টার ড্রাইভ । থাই সরকার এয়ারপোর্টে যাবার রাস্তাটা ফ্লাই-ওভার করে দিয়েছে যেন শহরের লোকজন অনায়েসে চলে আসতে পারে । অনেক দূর থেকেই চোখে পড়ে এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার ।

একটু আগে মালয়শিয়া থেকে এসেছি থাইল্যান্ডে । সস্তা উড়োজাহাজে চড়ে এসেছি । প্লেনের ভেতর খাবার কিনে খেতে হয় কিন্তু খাবারের দাম খুব কম । টিকেটের দাম এত স্বল্প যে, যে কেউ উড়োজাহাজে চড়তে পারে এখন ।

প্লেন থেকে নেমে হাঁটা দিয়েছি ইমিগ্রেশনের দিকে । লম্বা লাইন পড়েছে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ইমিগ্রেশনে পৌঁছানো গেলো ।

এক সুন্দরী ইমিগ্রেশন অফিসার এসে বললো,

সাইদ, তোমার পাসপোর্ট পড়া যাচ্ছে না । এক পাতার সাথে আরেক পাতা লেপ্টে আছে ।

আমি পাস্টপোর্ট খুলে দেখলাম, সত্যি তাই । ছবি সম্বলিত পাতাটা লেগে আছে আরেক পাতার সাথে । সস্তা কাগজ আর প্রযুক্তির জন্য এই হাল ।

আমি বললাম, তাহলে এখন কি করবে ?

- তোমার কাছে Invitation letter আছে ?

আমি বাড়িয়ে দিলাম ।

মেয়েটা পড়লো অনেকক্ষণ ধরে তারপর বললো, তুমি Chulalongkorn ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে এসেছো ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

মেয়েটা বললো,

শিক্ষকদের সম্মান করতে প্রতিটি থাই নাগরিক পছন্দ করে । আমি নিজেও করি । তোমাকে ভিসা দিয়ে দিচ্ছি তবে তোমার পাসপোর্ট চেন্জ করে ফেলো । না হলে অন্য কোথাও বিপদে পড়বে ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

কাস্টম, চেকিং, মালপত্র ছাড়াতে ছাড়াতে এক ঘন্টা লেগে গেলো তারপর Exit এর দিকে হাঁটা দিয়েছি । এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে দেখলাম ঝুর ঝুরে বৃষ্টি । মনটা ভরে গেলো বৃষ্টির গন্ধে । কি সুন্দর আকাশ বেয়ে বৃষ্টি নেমে আসছে তারপরে ঝুর ঝুর করে ভাসিয়ে ফিরছে এয়ারপোর্টের রানওয়ে, বেলকনি আর সামনে পড়ে থাকা খোলা যায়গা । রবীন্দ্রনাথের কথা এসে মনে ভর করলো ।

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরষা

তখন কেবল সকালের আলো ফুটতে শুরু করেছে । বৃষ্টির কারণে আকাশ ভার হয়ে আছে । ঘড়িতে সকাল আটটার ঘন্টি দিলো । আমাকে যে লোকটার নিতে আসার কথা ছিলো, সে এখনো আসেনি । বাইরে এসে কাউকে পেলাম না । অনেকক্ষণ দাড়িয়ে রইলাম Arrival এর মাথায় তারপর ভেতরে চলে এলাম । ওর কাছে আমার নাম্বার দেয়া আছে । প্রয়োজনে যোগাযোগ করবে ।

বলতে বলতে হ্যান্ডফোন বেজে উঠলো । একটা ভরাট কণ্ঠ ভেসে এলো,

- স্যার, মাফ করবেন । রাস্তায় চাকা ফেটে গিয়েছিল তাই এলোমেলো হয়ে গেছে সব টাইমটেবল । এক ঘন্টার মধ্যে আসছি ।

আমি বললাম, ঠিক আছে । আমি এরাইভেলে অপেক্ষা করবো ।

ফোন রেখে দিলাম । সারারাত এয়ারপোর্টে এয়ারকন্ডিশন চলেছে তার সাথে সকালের বৃষ্টি যোগ হয়ে তাপমাত্রা ক্রমেই নিচে নেমে এলো । আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না । ব্যাগ থেকে সোয়েটার বের করে জড়িয়ে বসেছি । একটু গরম কফি হলে ভালো হতো ।

হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে এলাম । একজন থাই মহিলা চা, কফি বিক্রি করছে । বয়স পন্চাশ পেরিয়েছে বলে মনে হয় কিন্তু কেমন শুকনো । থাইরা অবশ্য গড়ে সবাই শুকনো । খুব মোটা মানুষ চোখে পড়ে না এ দেশে তবে কার যে কত বয়স, সেটা বলতে খুব মুশকিলে পড়তে হয় ।

রেস্তরায় ঢুকতে দেখে মহিলা বললো, চা, কফি কিছু খাবে ?

- দিতে পারো । কফিতে চিনি কম দেবে ।

- ঠিক আছে, এই বলে মহিলা বিনয়ের হাসি হাসলো ।

প্লেন থেকে নেমে দেখেছি বড় বড় করে লেখা, Thailand - The Land of Smiles । প্রথম প্রথম কাথাটার অর্থ ধরতে পারিনি পরে জানতে পেরেছি এর কথা । থাই সমাজের কথা হলো, আগামী কালের কথা ভেবে আজকে মাথা খারাপ করো না । যা হবার হবে, এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই । মনকে সব সময় হাসিখুশি রাখবার চেষ্টা করবে । তখন আমার মনে হয়েছিলো, তাহলে এদেশের নাম থাইল্যান্ড না রেখে হাসি-খুশির দেশ রাখলেই পারতো ?

কফি চলে এলো । মহিলা বললো, একদম চিনি দেইনি । এই যে চিনির পোটলা, তুমি পছন্দ মতন ঢেলে নাও ।

আমি বললাম, এটাই ভালো করেছো ।

- হ্যাঁ, আমরা তাই করি । চিনি, দুধ সব কফির সাথে জুড়ে দেই, যার যার মতন নিয়ে নেবে ।

- ভালো ।

- তুমি কি এখনি নামলে ?

- এক ঘন্টা হলো ।

- কোথায় যাবে ?

- সুকুমভিট রোডে ।

- সাথে গাড়ি আছে ?

- হু । গাড়ি আসছে আমাকে নিতে ।

- তাহলে তো ভালো । ডিমের মামলেট করে দেবো ? আর টোষ্টেড ব্রেড ?

- না লাগবে না । তোমাকে ধন্যবাদ ।

ভালো করে খেয়াল করে দেখলাম ক্ষিদেয় পেট চো চো করছে । তার উপরে গাড়ি আসতে আরো এক ঘন্টা ।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, দিতে পারো, ডিমের মামলেট আর টোষ্টেড ব্রেড ।

- ঠিক আছে, একটু বসো । বানিয়ে আনছি ।

দশ মিনিটের মধ্যে এলো ডিমের মামলেট আর টোষ্টেড ব্রেড । কি সুন্দর মোলায়েম করে রুটি ভেজেছে ওরা । ডিমের মামলেট থেকে ধুঁয়া উড়ছে ।

আমি দেরি না করে খেতে বসে গেলাম ।

- আর কিছু লাগবে ?

- না । ধন্যবাদ ।

- একটু আমের জুস দেবো ?

- না এখন আর খাই না । তারপর বললাম, কখন বৃষ্টি নেমেছে ?

- আজ দুদিন হলো । থামবার কোন লক্ষণ নেই । আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে আবার ঝুর ঝুর করে নেমে আসে ।

- তাহলে তো খুব মজা । ঠান্ডায় ঠান্ডায় কাজ করতে পারো ।

মহিলা বললো,

এয়ারপোর্টের বাইরে মজা । বাসা-বাড়িতে বেশ লাগে । রাতে ভালো ঘুম হয় কিন্তু এয়ারপোর্টে ভালো লাগে না কারণ এমনিতেই এয়ারপোর্ট হিম হয়ে থাকে । তার উপর বৃষ্টি এসে কাঁপন ধরিয়ে দেয় । দেখ না কত ভারী জামা কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি ।

- তাহলে তো বিপদে আছো ?

মহিলা হাসলো । কিছু বললো না ।

আমি ডিমের মামলেটে কামড় বসিয়ে দিয়েছি । পুরো কাচের জানালা গলিয়ে দেখলাম ঝুর-ঝুরে বষ্টি । আমাদের অন্চলে এই বৃষ্টিকে কাইতান বলে । একটানা সাতদিন চলে তারপর একদিন বিরতি দিয়ে আবার নেমে আসে কাইতান ।

ছোটবেলার কথা মনে পড়লো । আমরা তখন ঢাকার অভয় দাস লেনে থাকতাম । বাড়ির পাশেই কামরুন্নেসা সকুল, ওখানে আমার বোনেরা পড়তো । যেদিন খুব ভ্যাপসা গরম পড়তো, বুঝতাম রাতে বৃষ্টি নামবে । আমাদের ধারণাটাই ঠিক হতো । স্কুলে পড়তাম বলে মা তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিতেন । অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যেত বৃষ্টির শব্দে । সড়সড় করে বৃষ্টি নেমে আসছে কাচের জানালা বেয়ে । তখন বিছানা ছেড়ে গিয়ে বসতাম জানালার পাশে ।

মা এসে বলতেন, বাবু । ঘুমাবি না ?

- এই তো যাচ্ছি ।

মা এসে বসতেন পাশে । মা আর আমি মিলে বৃষ্টি পড়া দেখতাম ।

মা বলতো, বাবু, তোর বুঝি বৃষ্টি খুব ভালো লাগে ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিতাম ।

মা বলতো,

আমরা ছোটকালে অনেক ভিজেছি । তোদের নানি বৃষ্টিতে ভিজতে দিতো না কারণ ভিজে ভিজে জ্বর বাধাতাম । তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ভিজতে হতো ।

আমি বললাম, এখন আর বৃষ্টিতে ভেজো না ?

মা হাসলেন, কিছু বললেন না ।

- বৃষ্টির কোন খানটা তোর ভালো লাগে, বাবু ?

- বৃষ্টির গায়ে রাস্তার যে আলো এসে পড়েছে, সেইটে সবচেয়ে সুন্দর ।

মা বললেন, কই দেখি ?

আমি মাকে দেখিয়ে দিলাম ।

- বাবু, তুই বড় হয়ে কি হবি ?

আমি হেসে বললাম, কি হলে তুমি খুশি ?

- শিক্ষক । বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ।

- ঠিক আছে, তাই হবো ।

খুশি হয়ে যেতেন আমাদের মা । মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, চল, এইবার শুবি ।

- ঠিক আছে চলো, এই বলে জানালা ছেড়ে বিছানায় উঠে আসতাম । পেছনে পড়ে থাকতো শুধুই বৃষ্টি, সাদা ফোটার বৃষ্টি ।

।। ২ ।।

সুকুমভিট রোড

হোটেলের সামনে খোলা জায়গা, যেমনি প্রশস্ত তেমনি চওড়া । পুরো জায়গাটা এয়ারকুলারে মুড়ানো, সেখানে সকালের নাস্তা খেতে বসেছি । সুকুমভিট রোডে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচতারা হোটেলে আস্তানা গেড়েছি মাস তিনেকের জন্য । ব্যংকক শহরের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে এই সুকুমভিট রোড, যে কেউ দেখিয়ে দিতে পারবে ।

ব্রেকফাস্টের জায়গাটা অনেক প্রশস্ত । অনেকগুলো টেবিল পাতা আছে সেখানে । কি সুন্দর লাল-নীল কাপড়ে টেবিলগুলো মুড়ানো । টেবিলের খাঁজে খাঁজে গাছ বুনে দেয়া আছে । সেই গাছে আবার সাদা ফুল । এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে কিভাবে গাছ গুলো ফুলে-ফুলে ভরে থাকে, তা বোধ গম্য হলো না । পরে জানতে পেরেছি সে কথা ।

হোটেল ওয়ালাদের কাছে সব সময়ে গাছগুলোর দুই সেট থাকে । এক সেট ওরা হোটেলের ছাদে ফেলে রাখে । প্রকৃতির হাওয়ায় বড় হয় ওগুলো । অন্য সেটটা হোটেলের কোনা-কান্চিতে ছড়িয়ে দেয়া হয় । হোটেলের কোনা-কাঞ্চিতে রাখা গাছগুলো যখন ঝিমিয়ে যায়, তখন ওগুলো ছাদে নিয়ে যাওয়া হয় । এ সময় যে সেটটা তরতাজা হয়ে আছে, সেটা হোটেলের কোনা কাঞ্চিতে বসিয়ে দেয়া হয় । এভাবে অদলবদল করে হোটেলের ভেতরে বাগান তৈরি হয়েছে ।

- সাদিকা । মাই নেম ইজ শিমলা, শিমলা আচার্য । আমি হোটেলের Executive Manager, এই বলে একটা মেয়ে দুই হাত এক কোরে নমস্কার করলো । নমস্কার করতে গিয়ে মেয়েটা ঝুঁকে পড়েছে । তারপর বললো, তোমার তো কোন অসুবিধে হচ্ছে না এখানে ?

আমি বললাম, না । আমি তো বেশ আছি, এই বলে দেখলাম একটা থাই মেয়ে । সাদা রঙের জামা আর গাউন পড়েছে । সাধারণ থাইদের চেয়ে একটু উঁচু । বয়স কত হবে ? এখনো ত্রিশ পেরোয়নি । আমার চেয়ে দুই এক বছরের ছোট হবে হয়তো । বাঙ্গালী স্টাইলে চুল বাঁধা, সারা মুখে পিনকের ছড়াছড়ি । কানের পাশটা লালচে হয়ে উঠেছে ।

আমি বললাম, কি দাঁড়িয়ে রইলে যে ? বসে পড়ো, এক সাথে Breakfast করি ।

- ধন্যবাদ, এই বলে শিমলা কথা না বাড়িয়ে বসে পড়লো ।

আমি বললাম, সাদিকা মানে কি ?

- সাদিকা মানে স্বাগতম । You are welcome । থাইরা সাধারণত Good Morning বা Good Evening বলতে অভ্যস্ত নয় । সাদিকা দিয়ে সবাইকে স্বাগত জানায় ।

শিমলাকে আমার পাশে বসতে দেখে হোটেলের কয়েকজন এগিয়ে এলো । তারা ভেবেছে আমি কোন VIP আর তা না হলে পাঁচতারা হোটেলের Executive Manager খেতে বসে না ।

শিমলা ইশারা ইংগিত করে বোঝালো তার কিছু লাগবে না তারপরেও একজন দাঁড়িয়ে রইলো ।

শিমলা বললো, তুমি তো বাংলাদেশ থেকে এসেছো ?

- কিভাবে বুঝলে ?

- Boarding card এ তোমার নাম আর প্রফেশন দেখেছি । সাইদ হোসেন, ইকোনোমিস্ট, বাংলাদেশী ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

- Boarding card না দেখেও বলে দেয়া যায় তুমি বাংলাদেশী ।

- কিভাবে ?

- তোমাদের চোখগুলো ইয়া বড় বড় আর নাক-কান খাড়া । চামড়ায় টান টান ভাব ।

- তুমি তো দেখছি খুব ভাল চেনো আমাদের ?

- হ্যাঁ চিনি কারণ আমার সেরা বন্ধুটি তোমাদের দেশের । নাম হাসিব আখতার । এক সাথে Thammasat University তে পড়েছি আমরা । হাসিবের সাথে তোমার অনেক মিল তাই কথা বলতে এলাম । কিছু যদি মনে না করো এখানে কোথায় এসেছো ?

আমি বললাম, মনে করবো কেনো ? আমি মালয়শিয়াতে চাকরি করি । ওখানকার এক ইউনিভার্সিটিতে পড়াই । এখানে এসেছি তিন মাসের জন্য পড়াতে ।

- কোথায় পড়াবে ?

- Chulalongkorn University তে ।

- Chulalongkorn University এখান থেকে কাছে । তাহলে আমাদের এখানে থাকছো তিন মাস ?

- হ্যাঁ ।

- ভালই হলো । তোমার সাথে মাঝে-সাঝে চা খাওয়া যাবে, এই বলে সুন্দর করে চা বানালো শিমলা । ক চামচ চিনি দেবো, স্যার ?

আমি বললাম, আমাকে স্যার বললে খুব অস্বস্তি বোধ করি । আমার নাম ধরে ডাকলে খুশি হবো ।

শিমলা জিভ কেটে বললো, Boarder দের স্যার বলাটা আমাদের strictly maintain করতে হয় । উপর থেকে বলা আছে ।

- কিন্তু কোন Boarder যদি comfortable বোধ না করে সে ক্ষেত্রে কি করবে ?

শিমলা চুপ হয়ে গেলো । তারপর আস্তে আস্তে বললো, সে ক্ষেত্রে কি করবো ভেবে বলতে হবে ।

- Yes, সেটাই ভাবো, আমি মাথা নেড়ে বিনয়ের সাথে বললাম ।

চা বানাতে বানাতে শিমলা বললো, ক চামচ চিনি দেবো ?

- এক চামচ ।

- একটু দুধ দেই ?

- না । এতেই চলবে । তুমি খাবে না ?

- না । আমি চা খাই না ।

- তাহলে একটু জুস নাও ? আমি তাড়া দিয়ে বললাম ।

- তুমি আগে নাও তারপর আমি নিচ্ছি । বসে বসে তোমার চা খাওয়া দেখি ।

- আমার চা খাওয়া দেখে কি করবে ?

- দেখতে ভালো লাগবে তাই দেখবো ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

শিমলা বললো, আগে কখনো থাইল্যান্ড এসেছো ?

- হ্যাঁ । ঘন্টা খানেকের Transit ছিল, তখন যেটুকু দেখেছি ।

- তাহলে তো দেখা হয়নি । ঘন্টা খানেকে আর কতটুকু দেখবে ? এ যে বিরাট দেশ ।

আমি হেসে বললাম, এবার সব দেখে ফেলবো ।

শিমলা বললো,

বাইরে থেকে অনেকে অনেক কিছু বললেও এদেশ কিন্তু এখনো কৃষির উপর দাঁড়িয়ে । কৃষি এদেশের প্রধান চালিকা শক্তি তবে শিল্পের প্রসার হচ্ছে ব্যাপক পরিসরে ।

আমি বললাম, এদেশের প্রধান বৈশিষ্ট কি ?

- দেশের সকল কেন্দ্র বিন্দুতে আছে এদেশের রাজা । যদিও রাজার সাংবিধানিক ক্ষমতা নেই বললেই চলে কিন্তু রাজাকে সবাই মেনে চলে । রাজাই হলো এদেশের ঐক্যের প্রতীক । জাতীয় পর্যায়ে কোন সমস্যা হলে রাজার মধ্যস্ততায় তা সমাধানের চেষ্টা চলে । এ দেশের রাজারা রামা নামে পরিচিত ।

আমি বললাম, যেমন, মিশরের রাজা মাত্রই ফারাও, রাশিয়ার রাজা মাত্রই জার, সে রকম কিছু ?

- ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিলো । থাই রাজা মাত্রই রামা । বর্তমানে রামা নাইন তখতে আসীন, সম্ভবত রামা নাইন বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘতম সময়ের রাজা ।

আমি বললাম, রাজার বাড়ি কি কাছেই ?

- খুব কাছে । তোমাকে নিয়ে যাবো একদিন রাজার বাড়িতে । রাজাকে না দেখাতে পারি, ওর Palace টা দেখাতে পারবো তবে টেলিভিশনে হামেশাই রাজাকে দেখবে ।

- হ্যাঁ দেখেছি গত রাতে । আজ ভোরেও দেখলাম । সকালটা শুরু হলো রাজা কে দিয়ে ।

- তাহলে তোমার দিন ভালো যাবে অন্তত আমার দিনটা ভালো যায় রাজা কে দেখে যাত্রা করলে ।

আমি হেসে বললাম, তোমার যদি ভাল যায়, আমারো ভাল যাবে ।

শিমলা বললো, তোমাকে ক স্লাইস ব্রেড দেবো ?

আমি নিচ্ছি, এ বলে উঠে দাঁড়ালাম ।

- তুমি বসো । আমি আনছি ।

আমাকে জোড় করে বসিয়ে রুটি ছেকে আনলো শিমলা । একটু দূরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিলো তাকে বললো দুই কাপ কফি দিতে ।

দেখতে দেখতে কফি এলো ।

শিমলা বললো, জেলি দেবো ?

- দাও ।

লাল সবুজ জেলি চলে এলো টেবিলে ।

- নাও । যেটা ভালো লাগবে তুলে নাও ।

আমি সবুজ জেলি মাখাতে লাগলাম কড় কড়ে ব্রেডের গায়ে । আগুনে পুড়ে ব্রেডগুলো কেমন লালচে রং ধারণ করেছে ।

শিমলা বললো, কবে থেকে তোমার পড়ানো শুরু হচ্ছে ?

- এই দুই দিন রেস্ট তারপর শুরু । সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস, বাকী চারদিন নিজের পড়াশুনা । ওরা খুব সুন্দর রুম দিয়েছে । চেয়ার, টেবিল, কমপিউটার সবি আছে ।

- যাতায়াত করবে কিভাবে ?

- প্রতিদিন গাড়ি আসবে সকাল নটায় আবার বিকেলে পৌঁছে দেবে ।

শিমলা বললো, তাহলে তো খুব ভাল । তোমার দিন ভালো যাবে ।

- বলতে পারো । কোন অসুবিধা দেখছি না ।

- তুমি কি নিয়ে কাজ করো সাইদ ?

- টাকার গতিবিধি নিয়ে কাজ করি । ঠিক কতটা টাকা বাজারে ছাড়তে হবে, তার একটা যুৎসই হিসাব বের করবার চেষ্টা করি । টাকা বেশি বা কম ছাড়লে চলবে না, ঠিক যুৎস পরিমাণে ছাড়তে হবে ।

- তুমি তো অর্থনীতিবিদ । তোমরা বাংলাদেশীরা অর্থনীতিতে খুব ভালো, তাই না ?

- কি জানি । তোমার কি মনে হয় ?

- আমার মনে হয় বলেই তো বললাম । তোমাদের অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ইউনুস তো নবেল জিতে নিলেন ?

- হু ।

- তুমি কবে নবেল পাচ্ছো ?

আমি হেসে বললাম, তোমার কি মনে হয় ?

শিমলা হেসে বললো, তোমরা তো সাহিত্যেও খুব ভালো ।

- হু । বলতে পারো ।

শিমলা বলতে লাগলো,

তোমাদের দেশের জীবনানন্দ দাশ আমার ফেবারেট । আমি প্রায়ই পড়ি ওর লেখা । আমার লাইব্রেরিতে জীবনানন্দ দাশের সব কালেকশন পাবে, সেই সাথে ওর ছবি । যেদিন থেকে জীবনানন্দ পড়তে শুরু করি, তখন থেকে তোমাদের দেশ সম্পর্কে আমার আগ্রহ । তোমাদের দেশের কোন মানুষ পেলে কথা বলবার চেষ্টা করি ।

আমি বললাম, জীবনানন্দের সন্ধান কিভাবে পেলে ?

- আমি Thammasat University তে সাহিত্য আর দর্শন নিয়ে পড়েছি । সেই সুবাদে জীবনানন্দের খবর পাই ।

আমি বললাম, তাহলে এই পাঁচতারা হোটেলের চাকরি পেলে কিভাবে ?

- Thammasat University তে Bachelor করবার পর অস্ট্রেলিয়াতে MBA করেছি । আমার MBA তে Major ছিলো Accounting, সেই সুবাদে হোটেলের চাকরিটা পেয়ে যাই ।

- তাহলে তো তুমি সাহিত্য, দর্শন, ব্যবসা-বাণিজ্য সবই জানো ।

শিমলা হেসে বললো,

তা ঠিক না । কিছু কিছু জানি, বাকীটা তোমার কাছে শিখবো । তুমি তো অর্থনীতিবিদ, Monetary Economist । তোমার কাছে ঢের ঢের অর্থনীতির খবর পাওয়া যাবে ।

আমি বললাম,

তাহলে তোমার চর্চা কোন দিকে ? সাহিত্য না অর্থনীতি ?

- দুটোই । যখন যেটাতে সুযোগ পাই । তুমি এসব সাহিত্য চর্চা করো না ?

আমি বললাম,

আমাকে হাজার গুতোলে এক লাইন কবিতা আসবে না, তবে কেউ লিখলে পড়তে বসে যাই । তোমার বন্ধু হাসিবের কি এই সব বাতিক ছিলো ?

- সে তোমার মতনি, নিজে কিছু লিখবে না তবে কোন লেখা পেলে সেটা নিয়ে বসে যেতো । এই যে বসতো, না শেষ করে উঠতো না । তোমাদের দেশের ছেলেরা খুব ভালো, তাই না সাইদ ?

আমি হেসে বললাম, এখন কোথায় আছে হাসিব ?

- Dallas । সুদূর আমেরিকাতে । চাকরি করে ভাল কোম্পানীতে । বিয়ে করেছে পছন্দের মেয়েকে । এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে সাজিয়েছে সুখের সংসার ।

- তোমার সাথে যোগাযোগ আছে ?

- আছে, প্রায় E-mail করে । বউ বাচ্চা পেয়ে বন্ধুদের ভুলে যায়নি ।

- তাই, বলে আমি চুপ করে গেলাম ।

দুজনে নীরবে খেয়ে চলেছি । শিমলা পারতপক্ষে কিছুই নেয় নি । একটি রুটির মাথা নিয়ে সেই সকাল থেকে নাড়াচাড়া করছে । মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে । এই নীরবতা ভেঙে আমি বললাম,

জীবনানন্দ দাশের কোন কোন কবিতা পড়েছো ?

- বলতে পারো সবি । বনলতা সেন, রুপসী বাংলা, ধুসর পান্ডুলিপি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি । এর মধ্যে ভালো লেগেছে আকাশলীনা, বনলতা সেন, হাওয়ার রাত, কুড়ি বছর পরে কবিতাগুলো ।

- বলতে পারবে দুই এক লাইন ?

- ঠিক আছে, এই বলে শিমলা বলতে শুরু করলো,

> সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
> বলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে ;
> ফিরে এসো সুরন্জনা ;
> নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে ;

- কেমন লাগলো সাইদ ?

- দারুণ । খুব সুন্দর । এইটে কোন কাব্যগ্রন্থের ?

- সাতটি তারার তিমির কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা । কবিতার নাম আকাশলীনা, এইটে লিখে জীবনানন্দ দাশ নাম কুড়িয়ে নেন ।

আমি বললাম,

আমার মনে পড়েছে । আমার এক বন্ধু সব সময় আবৃত্তি করতো এই কবিতাটা আর বিড় বিড় করে কি যেন বলতো । যাইহোক, আরো একটা শোনাও ।

- ঠিক আছে । এবার বনলতা সেন থেকে দুই এক লাইন বলছি ।

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথীবির পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দুরে অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন ।

আমি বললাম,

এ যে দারুণ ব্যাপার । আজ সকালটাই শুরু হলো কবিতা দিয়ে । এই বিদেশ বিভুঁয়ে বাংলাদেশের কবিতা শুনবো, ভাবাই যায় না । আশা করছি কবিতায় কবিতায় ভরে থাকবে বাকী দিনগুলো ।

শিমলা বললো, তুমি কি এসব পড়েছো ?

- কিছু কিছু পড়েছি । তোমার মতন মুখস্থ বলতে পারবো না । তোমার আবৃত্তি শুনে মনে পড়ছে ।

শিমলা বলতে শুরু করলো,

জীবনানন্দ দাশ পড়বার পর থেকে তোমাদের শিল্প, সাহিত্য আর দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ি । ধীরে ধীরে সন্ধান পাই রবীন্দ্রনাথের । তারপর পর্যায়ক্রমে নজরুল, সুনীল, বুদ্ধদেবের কথা জানতে পারি । সেই থেকে ঠিক করেছি তোমাদের দেশের কোন মানুষ পেলে আলাপ করবো, পরিচিতি হবো ।

- তাহলে কি সেই সূত্র ধরে হাসিবের সাথে পরিচয় ?

- ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিল । তোমাদের দেশের সেরা ছাত্র হাসিব আখতার Thammasat University তে পড়তে এলো, এই বলে আস্ত একটা ব্রেড তুলে দিল আমার পাতে । তারপর বলতে লাগলো,

একদিন ইউনিভার্সিটি ক্যাফেটেরিয়াতে বসে আছি । দেখলাম একটা ছেলে আমার পাশ দিয়ে যায় । আমার এক বন্ধু বললো, এই ছেলেটা কিন্তু বাংলাদেশ থেকে এসেছে । তোর তো আবার বাংলাদেশ প্রীতি আছে, এই বলে সবাই হেসে উঠলো ।

আমি সেদিকে তাকালাম না, দেখলাম হাসিব গিয়ে বারান্দায় বসেছে । আমি গিয়ে হাজির হলাম ।

- তুমি বাংলাদেশ থেকে এসেছো ?

ছেলেটা হেসে দিলো । হ্যাঁ কেন ?

- তোমার সাথে কথা বলতে পারি ?

- হ্যাঁ পারো । এভাবে হাসিবের সাথে পরিচয় ।

আমি বললাম,

তাহলে তো তুমি হাসিবকে চেনো, জীবনানন্দ দাশকে চেনো, সেই সুবাদে বাংলাদেশের অনেক কিছু ।

- হ্যাঁ বলতে পারো । আমি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে একটা ওয়েবসাইট maintain করি । তার লেখা, তার ছবি দিয়ে ভরে ফেলেছি ওয়েবসাইট ।

- এ যে দারুণ ব্যাপার । তাহলে তো যে কেউ জীবনানন্দকে জানতে পারবে, জানতে পারবে ওর সব কর্মকান্ড ।

- সে জন্যই তো করেছি ।

- তোমার web address টা জানতে পারি ?

- এই নাও, এই বলে শিমলা web address টা লিখে দিলো ।

- মজার ব্যাপার কি জানো এই ওয়েবে দেখবে আমি জীবনানন্দ দাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছি । দুজন হাসছি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে । আসলে এইটে ক্যামেরার কারসাজি ।

আমি বললাম, অনেকেই করে এসব । তাতে দোষের কিছু দেখছি না । ফ্যানরা করবে এটাই স্বাভাবিক । একবার ঘুরে যাও না বাংলাদেশে ?

- নিশ্চয় যাবো । বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতে গিয়েছি ছোটকালে ।

- কোথায় গিয়েছিলে ?

- শিমলা । হিমাচল প্রদেশের রাজধানী, উঁচু পাহাড়, বরফ আর অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ী জনপদ ।

- কেনো গিয়েছিলে ?

- আমার বাবা শিমলায় কাটিয়েছেন অনেক বছর । পেশায় সিভিল ইন্জিনিয়ার । বাবার কোম্পানি একটা শাখা খুললো শিমলাতে । বাবার পোস্টিং পড়লো ওখানে । সেই সুবাদে শিমলা গিয়েছিলাম । এক বছর থেকেছি । ক্লাস সিক্সের পড়াটা ওখানকার এক স্কুলে সারি তারপর ফিরে আসি ব্যাংককে । বাবা আসা যাওয়ার মধ্যে থাকতেন ।

- তোমার শিমলা নাম কি সেখান থেকেই ?

- ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিলো । আমার যখন জন্ম হয়, তখন বাবা শিমলাতে । টেলিফোন করে মা জানালো আমার জন্মের কথা । বাবা আমার নাম রাখলেন শিমলা, শিমলা আচার্য । সেই থেকে শিমলা ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । কিছু বললাম না ।

- তোমার কখনো শিমলা যাওয়া পড়েছে ?

আমি মাথা নেড়ে না বললাম ।

- ভুল করবে যদি না যাও ।

- কেন ?

শিমলা বললো,

এ যে নুতন এক পৃথীবি । বিলিয়ন ডলার খরচ করে মানুষ মহাশুন্যে যাচ্ছে নুতন পৃথীবির খোঁজে আর তুমি ঘরে বসেই নুতন পৃথীবি দেখছো ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

শিমলা বলতে লাগলো, এক বছর ছিলাম । কি যে ভালো লেগেছে সেই দিন গুলো ।

- শিমলা নিয়ে কিছু বলবে ?

শিমলা বলতে শুরু করলো,

পুরো শিমলা পাহাড়ের খাঁজে বানানো । সেই পাহাড়ের খাঁজে মানুষেরা হরেক রকমের ঘর-বাড়ি বানিয়েছে । অফিস থেকে বাবা দোতলা বাড়ি পেয়েছিলেন । আমি বেছে বেছে দক্ষিণের ঘরটা নিলাম । সেই ঘর লাগোয়া বারান্দা, সেই বারান্দা বরাবার নেমে গেছে পাহাড়ী খাদ । সেই খাদ ভরপুর হয়ে ছিল হাজারো গাছ গাছালিতে ।

একটু থেমে শিমলা আবার বলতে শুরু করলো,

সারা বছর জুড়ে ঠান্ডা বয় শিমলাতে । আমরা মাঝারি ভারী কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াতাম তবে শিতকালে হাড় কাঁপানো শীত । তখন ভারী কাপড় না চাপালেই না । এক দিনের কথা মনে পড়ে, শুনবে ?

- প্লিজ বলো ।

শিমলা বলতে লাগলো,

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলো তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে বসেছি । তখনো অন্ধকার কাটেনি । বারান্দায় বসতেই হাড় কাঁপানো শীত এসে বিধতে লাগলো । মোটা সোয়েটার আর বিছানার ব্ল্যাংকেট চাপিয়ে নিয়েছি । দৃষ্টি চলে গেলো সামনে পরে থাকা বিস্তৃত পাহাড়ী অরণ্যে । তাকিয়ে দেখলাম দূরে, অনেক দূরে পাহাড়ী চূড়ায় বরফ জমে আছে । মনে হলো সাদা মুকটু পড়ে বসে আছে পাহাড়গুলো । কিছুক্ষণ যেতেই সাদা মুকুট থেকে আলো ছড়াতে লাগলো । বুঝলাম সুয্যি মামা পাহাড়ী চূড়ায় উঠে আসছে । এক সময় দেখলাম সারাটা পাহাড় সোনালী আলোয় ভরে উঠেছে । ধীরে ধীরে তার আভা ছড়িয়ে পড়লো বীস্তির্ণ পাহাড়ী অরণ্যে, এই বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো ।

- কেমন লাগলো সাইদ ?

- এ যে দারুণ ব্যাপার । এ না দেখলেই না ।

শিমলা হেসে দিলো ।

আমি বললাম, এই শিমলা নামটা কোত্থেকে এলো ?

- দেবী শ্যামলার মন্দির আছে শিমলায় । সেই শ্যামলা দেবী থেকে এই শিমলার নামকরণ ।

- এই শ্যামলা দেবী কি কালি দেবীর আরেক রুপ ?

- ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিলো । তুমি মনে হয় ভারতীয়দের খুব চেনো ?

আমি বললাম,

আমাদের তিনপাশেই যে ভারত । ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতি আমাদের ব্যাপক প্রভাবিত করে । বাংলা সাহিত্যের বড় বড় দিকপাল পাবে এই ভারতবর্ষে । কত যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ছড়িয়ে আছে এদেশে, তার ইয়াত্তা নেই । অনেকে বলে, প্রতি বিশ কিলোমিটার পর পর নূতন নূতন মানুষ, বিশ্বাস ও আচার-আচরণ চোখে পড়বে । দেব-দেবী, প্রেরিত পুরুষ, মহাপুরুষ আর অবতার দিয়ে ঠাসা এই ভারতবর্ষ ।

শিমলা বললো, তোমার কখনো ভারতে যাওয়া পড়েছে ?

- ছোটকালে গিয়েছিলাম বাবা-মার সাথে । এর পর আর যাওয়া হয়নি । তবে শিমলার কথা শুনে লোভ হচ্ছে ।

- সুযোগ পেলে যেও । শিমলা অবশ্যই রাখবে লিস্টে ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, বললাম, আর কি কি দেখলে শিমলায় ?

- রাতের শিমলা অন্য রকম । শীতকাল এলে বরফ পড়তে শুরু করে । সেই বরফে ঢেকে যায় পাহাড়ী উপত্যকা ।

- তাহলে তো পূর্ণিমা রাতে দারুণ লাগবে ?

- সে কথাই তো বলতে চাচ্ছি, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শিমলা বলতে শুরু করলো,

দিন পেরিয়ে রাত এলো । চন্দ্র মামা উঠে এলেন পাহাড়ী খাঁজে তারপর আলো ছড়াতে লাগলেন । সেই আলো গিয়ে পড়লো বরফে ঢাকা বিস্তীর্ণ উপত্যকায় । তাকিয়ে দেখলাম আমার বারান্দা, বাড়ির আঙিনা আর সদরের রাস্তা সাদায় সাদায় থিকথিক করছে । এ এক সাদা আলোর দেশ ।

আমি বললাম, এখনো কি মনে পড়ে সেই সাদা আলো দেশের কথা ?

- হু মনে পড়ে । এ যে ভুলবার না । মাঝে মাঝে অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায় । তখন আর ঘুম আসে না । বারান্দায় গিয়ে বসি, মনে এসে ভর করে পূর্ণিমার আলোতে থিকথিক শিমলার কথা । শিমলার মতন এমন সাদা আলোর দেশ কখনো দেখেছো ?

- দেখেছি ।

- কোথায় ?

- বাংলাদেশে ।

- ঠিক আছে বলো, শুনি ।

আমি বলতে লাগলাম,

শীতকালে গ্রামের বাড়ি ফিরছিলাম যমুনা নদী দিয়ে । নৌকায় চড়ে বসেছি । শীতকাল বলে কিছুদূর পর পর চর পড়েছে, সেই চরকে ঘিরে কাশ ফুলের বাগান । সেদিন ছিলো ভরা পূর্ণিমা, চাঁদের আলোতে থৈ থৈ করছে চারিপাশ । আমাদের নৌকাটা কাশফুলের পাশ দিয়ে যেতে শুরু করলো । ধবধবে কাশ ফুল আর পূর্ণিমার আলো মিলেমিশে সাদা আলোয় পরিণত হলো । যেদিকে তাকাবে শুধুই সাদা, এ আরেক সাদা আলোর দেশ ।

- নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়, জীবনানন্দ দাশ সম্ভবত তোমার দেখা কাশফুলের বাগান দেখে এমন লিখেছেন ।

আমি হেসে দিলাম, কিছু বললাম না ।

শিমলা বললো, আর বালু চরে যে সাদা বালু চিকচিক করছিলো, তা তো বললে না ?

- চাঁদের আলো আর বালুর রকমারি আমাদের নিয়ে গেলো এক রুপকথার দেশে । সে আরেক সাদা আলোর দেশ । এমন এক দেশ যা আগে কখনো দেখিনি, এই বলে আমি চুপ হয়ে গেলাম ।

শিমলা কিছু বললো না । অল্প অল্প হাসতে লাগলো ।

আমি বললাম, হাসছো যে ?

- না এমনি । একটা মজার কথা মনে পড়েছে তাই হাসছি ।

- বলো শুনি ।

- অন্য দিন বলবো । সব বললে তো ফুরিয়ে গেলো ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না ।

দেখতে দেখতে ব্রেকফাস্ট আওয়ার শেষ হয়ে এলো । আমাদের খাওয়া শেষ হয়েছে । আমি পরিষ্কার রুমালে হাত মুছে নিয়েছি । চায়ের কাপও খালি হয়ে এসেছে ।

শিমলা বললো,

একদিন আসো না আমার অফিসে ? চার তলায় বসি । ওখানে গিয়ে যে কেউকে বললে আমার অফিস দেখিয়ে দেবে ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

- কিছু লাগলে আমাকে ফোন দিও, এ বলে ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিলো । ঝক ঝকে সাদা কার্ড । ডান দিকে হোটেলের লগো । বায়ে ছোট্র করে লেখা, Shimla Acharzo, Executive Manager (Operational and Accounts).

লিফটে চড়ে বসেছি । লিফট আমাকে পৌঁছে দেবে পনের তলায় । নিঃশব্দে লিফটটা ছুটে চলেছে । আমার শুধু মনে হতে লাগলো, শিমলা কেন অল্প অল্প হাসতে লাগলো ? আমি কি অস্বাভাবিক কিছু বলেছি ? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন লিফটের দরজা খুলে গেছে, খেয়াল করিনি । লোকজন ঢুকতে শুরু করেছে । আমি নেমে হাঁটা দিলাম রুম বরাবার ।

।। ৩ ।।

নানা নুয়া থেকে সাকেত

সুকুমভিট রোডের পাশেই খাল । চাও-ফ্রেয়া নদী থেকে গড়িয়ে এসে এই খাল ব্যাংককের ভেতর দিয়ে চলে গেছে । নৌপথে শহরের লোকজন যাতায়াত করে এই পথে । কিছুক্ষণ পর পর ঘাট । লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে ঘাটে । প্রতি দশ মিনিট পর পর একটা বোট আসে, লোকজন নেমে যায় আবার উঠে পড়ে কয়েকজন । ছেড়ে দেয় নৌকা ।

আমার হোটেল সুকুমভিট রোডে । সেখান থেকে পায়ে হেঁটে খালের ঘাটলায় এলাম । ঘাটের নাম নানা নুয়া । বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে বোটের জন্য । খালটা তেমন চওড়া না, খুব বেশি হলে দু তিনটে বোট পাশাপাশি যেতে পারবে । যখন বোটটা এগিয়ে চলে, তখন খালের ঢেউ আছড়ে পড়ে দুই পাড়ে তাই খালের পাড় মজবুত করে বাঁধানো হয়েছে যেন শহরের ভূমি ধসে না যায় ।

বোটটা আসতেই লোকজন নেমে এলো । আমরা যে কয়জন অপেক্ষা করছিলাম, তারা চড়ে বসলাম বোটে । একটু পরেই ঘড় ঘড় শব্দে বোটটা চলতে শুরু করলো । সাকেত গিয়ে পৌঁছাবে যানটা ।

বোটাটা ছুটে চলেছে । খালের পাড় দিয়ে ছোট-ছোট ছাপরার ঘর, কি সুন্দর ছোট ছোট বাগান করেছে সবাই । কেউ কেউ আবার ঘর থেকে লতা-পাতা ঝুলিয়ে দিয়েছে খালের পানিতে । কতগুলো ছেলেপুলে দেখলাম উঁকি মারছে জানালা দিয়ে । আমি হাত উঁচিয়ে দিতেই ওরা হাত বাড়িয়ে দিলো ।

সামনের একটা ঘাটে নেমে গেলাম । ভাবলাম এর পরের বোটে সাকেত যাবো । খালের পাড়ে যে সব সাজানো ঘর-বাড়ি দেখেছি, সে গুলোর ছবি তুলবার খুব লোভ হলো । সাথে আছে SLR ক্যমেরা । এইটে দিয়ে সাটার স্পীড, এ্যাপারচার আর আলোর একটা যুৎসই সমন্বয় করে নিঁখুতভাবে ছবি তোলা যায় ।

ছেলেবেলা থেকে ফটোগ্রাফির উপর আগ্রহ ছিলো । সুযোগ পেলে এদিক ওদিক ছবি তুলতাম । সবচেয়ে বেশি ছবি তুলেছি পুরোনো ঢাকার কোনা কাঞ্চির । যেমন, পুরোনো দেয়াল চুইয়ে পানি পড়ছে অথবা অন্ধকার গলির মাথায় এক টুকরো সুর্যের আলো । মাঝে মাঝে উপযুক্ত সানলাইটের জন্য অপেক্ষা করেছি ঘন্টার পর ঘন্টা । কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি পূর্ণিমার যুৎসই Angel পাবার জন্য । যখনি যুৎসই আলো পেয়েছি, ঝটাপট ছবি তুলে ফেলেছি । তারপর শুতে গেছি ।

হাঁটতে হাঁটতে ফুলে-ফুলে সাজানো বাড়িগুলোর সামনে এলাম তারপর সুয্যি মামাকে যুৎসই অবস্থানে রেখে ছবি তুলতে লাগলাম একের পর এক নানা Angel থেকে । এই আলোর ব্যাপারটা ঠিক মত ফায়সালা না হলে, সব চেষ্টা ভেস্তে যাবে । তাই আলো আর ছায়া, এই দুই ব্যাপারকে মাথায় রেখে ছবি তুলে চলেছি । আলোটা একটু কম হলে ভালো হতো কিন্তু সূয্যি মামাকে যে বলবো একটু সরে দাড়াও, তার যো নেই । আমাকেই অপেক্ষা করতে হবে তার সরে যাওয়া পর্যন্ত ।

দেখলাম কতগুলো ছেলেপুলে এসে দাঁড়িয়েছে । ওদেরকে দাঁড় করিয়ে দিলাম লাইন ধরে তারপর ঝটাপট ছবি নিলাম । ঐ যে একটা বোট ধেয়ে আসছে । ক্যামেরায় বন্দি করলাম বোটটাকে । মনে মনে ভাবলাম, বৃষ্টি নামলে খুব ভালো হতো । বৃষ্টির ছিটে-ফোঁটার মধ্যে, এই লতা-পাতা ঘেরা ঘুপচি ঘর গুলো খুব ভালো আসতো । বাংলাদেশ হলে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতাম কিন্তু বিদেশ বিভুঁইয়ে অন্য মানুষের বাড়ির উঠোনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায় না । SLR ক্যামেরাটা বাক্সে বন্দি করে নেমে এলাম ঘাটলায় । এখান থেকে সাকেত যাবো খাল মাড়িয়ে ।

ব্যাংকক শহরে আড়াআড়িভাবে এই খাল । শহরের হাজার হাজার মানুষ এই পথে যাতায়াত করে প্রতিদিন ফলে শহরের উপর চাপ কমে আসে । খালের পথে যেহেতু Traffic Jam নেই, লোকজন ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যায় । ঢাকা শহরেও এরকম অনেক খাল ছিলো । এখন সে সব বুজিয়ে ফেলা হয়েছে । সেখানে গড়ে উঠেছে রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি আর আবাসন প্রকল্প ফলে ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতা নিত্য-দিনের ব্যাপার । একটু বৃষ্টি হলে পানি জমে যায়, গড়িয়ে যেতে পারে না ।

আবার নৌকাতে চড়ে বসেছি । আবার সেই ঘড় ঘড় শব্দ । রাস্তায় অনেক ছবি তুললাম । ঘর-বাড়ি, ফিরতি বোট আর দুই-পাড়ের ছবি । দেখতে দেখতে সাকেত চলে এলো । এইটে শেষ ঘাট । বোট থেকে নেমেই চোখে পড়লো বুদ্ধের Temple, অহিংস মানব গৌতমের উপাসনালয় ।

www.sayedhossain.com

|| ৪ ||

প্রাতুনাম

প্রাতুনামে এসেছি কিছুক্ষণ হলো । এখানে বেশ কিছু শপিং মল আছে । হোটেলের ফ্রিজে রেখে দেবার জন্য কিছু খাবার যেমন, ব্রেড, বাটার, ফ্রুটস ইত্যাদি কিনবো । মাঝে মাঝে রাতে ক্ষুদা লাগে, কিছু না খেলেই না ।

সুন্দর করে আম, পেয়ারা, কেটে রেখেছে একজন বিক্রেতা । কয়েকটা নিয়ে নিলাম । ফলওয়ালা সেধে দাম কম রাখলো । বললো, আবার এসো এরপর থেকে ওর কাছে ফল কিনি ।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে । কাল ছুটি বলে মার্কেটে খুব ভিড় । অনেকেই এসেছে কেনা-কাটা করতে ।
ভাবলাম Dinner করে হোটেলে ফিরি । কোথায় খাবো তা নিয়ে ইতস্তত করছি ।
হঠাৎ কে যেনো বলে উঠলো, কখন এসেছো ?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শিমলা, শিমলা আচার্য । আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে । আমি বললাম, একটু আগে । তুমি ?

- আমিও এলাম এই মাত্র । কি কি কিনলে ?
- কিছু Fruits আর Canned খাবার ।
- এই Canned খাবার খেও না সাইদ, Industrial Item এ ভরা । পেটে গিয়ে জ্বালাতন করবে । তোমাকে ভালো হোটেল দেখিয়ে দেবো ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

শিমলা বললো, Fruits গুলো ভালো । আমি তো Regular Fruits খাই ।

- তোমাকে দেখলে বোঝা যায় ।
- কিভাবে বুঝলে ?
- সব সময়ে ফ্রেশ ফ্রেশ ভাব । কোথাও কোন দুঃখ নেই ।

- তাই, বলে শিমলা হেসে দিলো । অনেকক্ষণ হাসলো মেয়েটা ।

আমি বললাম, হাসছো যে ?

- না এমনি । তোমার কথাগুলো খুব নূতন । আগে কখনো শুনিনি এভাবে । চলো, ডিনার করি । আজ তুমি আমার মেহমান ।

- ঠিক আছে, আমি মাথা নাড়লাম ।

শিমলা বললো,

ঐ চৌরাস্তা পেরুলে একটা হোটেল আছে । শাক-শবজি দিয়ে হাজার পদের রান্না করে ওরা । তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না ।

- তুমি কখোনো খেয়েছো ?

- অনেক বার । চলো আর দেরি করি না ।

রাস্তা পেরিয়ে আমরা নির্জন জায়গায় চলে এসেছি তারপর একটু বাঁক নিতেই হোটেলটা । দোতলা হোটেল, ঝকঝকে পরিস্কার । সামনে এক ফালি বাগান, সেই বাগান পেরিয়ে হোটেলের চত্বর । আমরা ঢুকতেই সাদা পোশাকের ওয়েটার এসে দাঁড়ালো । মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, প্লিজ, এদিকে ।

মস্ত বড় ঘর, কাঠের আসবাবে সাজানো । সুন্দর করে ক্লথ বিছিয়েছে টেবিলের উপরে । হালকা মিউজিক ভেসে আসছে ওদিক থেকে সম্ভবত থাই কোন মিউজিক । ঘিয়া রঙের আলোতে ভরে আছে ঘরটা ।

আমরা গিয়ে কোণায় বসলাম । তেমন লোকজন নেই, তিন চারটা ফ্যামিলি চোখে পড়লো । দেখে বুঝলাম এরা সব Indian Muslim ।

শিমলা বললো, কি খাবে ?

- ভাত ।

- ভাতের সাথে টমেটো, সালাদ আর শাক-শবজি দিতে বলি ?

- বলো ।

- Drinks কি খাবে ?

- Mango juice দিতে পারো ।

ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেলো ।

শিমলা বললো,

এ হোটেলের মালিক একজন Indian Muslim । মাদ্রাজ থেকে এসেছিলেন ভদ্রলোক তারপর এক থাই মেয়ের প্রেমে পড়ে বিয়ে থা করে থেকে গেছে । রাস্তা পেরুলো ওর বাসা ।

- এ রকম পরিবার কি আরো আছে ?

- অনেক আছে সাইদ । থাই মেয়েরা ট্র্যাডিশনালি স্বামি ভক্ত আর পরিশ্রমি তাই বিদেশীদের ধরে রাখতে ওদের বেগ পেতে হয় না ।

আমি বললাম, তোমার কথা শুনে লোভ হচ্ছে । মনে হচ্ছে কোন থাই মেয়ের হাওলায় নিজেকে ছেড়ে দেই ।

তাই, বলে শিমলা হেসে দিল । তারপর বললো, তোমার মতন হাসিবও বলতো কিন্তু ওর affair ছিলো বাংলাদেশের এক মেয়ের সাথে তাই ওকে থাই মেয়ের আশ্রয় নিতে হয়নি ।

- তখন বুঝি তোমার হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো ?

- না সাইদ । হাসিব তো শুধুই বন্ধু । এর বাইরে আমরা দুজনের কেউ ভাবতাম না ।

- Sorry, মাফ করবে, এমনি এমনি বলেছি ।

- It is all right, I know that ।

আমি বললাম,

সেদিন এক বাংলাদেশীর সাথে আলাপ হলো । ভদ্রলোক ছোটখাট চাকরি করেন । থাই মেয়ে বিয়ে করেছেন । বউয়ের খুব প্রশংসা করলো । তার বউ ঘর-বাড়ি সাজিয়ে রাখে, কাজের মেয়ে রাখতে চাইলে রাখতে দেয় না । বলে আমি একাই পরবো, তুমি খামাখায় খরচ করবে কেনো ? ওদের দুই মেয়ে, সকুলে পড়ে । খুব ভালো আছেন ভদ্রলোক । কথায় কথায় হাসেন ।

শিমলা হেসে দিলো, কিছু বললো না । মনে হলো সে খুব গর্ব বোধ করছে ।

আমি বললাম, যদি কিছু মনে না করো তো একটা প্রশ্ন করি ?

- ঠিক আছে করো ।

- তোমার বাসায় কে কে আছে ?

- এইটে নিয়ে এত ইতস্তত করবার কি আছে? আমরা দুই বোন, আমি বড় । ছোট বোনটার বিয়ে হয়ে গেছে । ব্যাংকে চাকরি করে, ওর হাসব্যান্ডও ব্যাংকার । ওদের একটা ফুরফুরে মেয়ে আছে, নাম অর্চনা । মাটির নিচ দিয়ে হাঁটে ।

আমি বললাম, অর্চনা নামটা সুন্দর । এ তো ভারতীয় নাম ?

- ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি থাইদের ব্যাপক প্রভাবিত করে । আমরা যে থাই ভাষায় কথা বলি, তা সম্ভবত সস্কৃত থেকে এসছে । থাই সমাজের অনেক কিছু ভারতীয়দের কাছ থেকে নেয়া ।

আমি বললাম, আর কে কে আছে তোমাদের বাসায় ?

- বাবা নেই, মারা গেছেন বছর খানেক হলো । মাকে নিয়ে শহরের শেষ প্রান্তে আমরা থাকি । চাও-ফ্রেয়া নদী লাগোয়া আমাদের বাসা । মাঝে মাঝে নদীতে বেড়াতে যাই ।

আমি বললাম, তাহলে বিয়ে শাদি করনি ?

- করবার সময় পেলাম কৈ ? Thammasat থেকে বেরিয়ে পড়তে গেলাম অষ্ট্রেলিয়ায় । MBA করতে দুই বছর তারপর পাঁচতারা হোটেলে জয়েন করেছি । সব কিছু গুছিয়ে নিতে নিতে সময় চলে গেলো ।

আমি হেসে বললাম, এখন তো আর বিয়ে শাদিতে বাধা নেই । ভাল চাকরি করো, সংসারে ঝুট ঝামেলা নাই ।

- এতো দিন কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম । আমার বরাবরি প্ল্যান ছিলো ভাল মতন না দাঁড়িয়ে বিয়ে থা করবো না ।

- এখন তো দাঁড়িয়ে গেছো । সেরা হোটেলের সেরা ম্যানেজার ।

- Yes এখন আর অসুবিধা দেখছি না কিন্তু রাজপুত্রটি তো এসে বলছে না, শিমলা, আমি এসেছি, উঠে এসো আমার নৌকায়, এখনি পাল উড়াবো ।

- তুমি তো সব দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছো ? রাজপুত্র ঢুকবে কিভাবে ? ব্যাংকক শহরের সুন্দরী, শিক্ষিত ও ধনাঢ্য তরুণীর তো রাজপুত্রের অভাব হবার কথা না ।

শিমলা এইবার লজ্জা পেয়ে গেলো । বললো,

যাও, দরজাটা খুলে দিলাম, যতটুকু খোলা যায়, এই বলে আবারও হেসে উঠলো । আমি তাকিয়ে দেখলাম হাজারো নক্ষত্রের আলো এসে পড়েছে আমার চারিপাশে ।

একটু আগে বেয়ারা খাবার দিয়ে গেছে । সবগুলোই ভেজিটেবল আইটেম । বাংলাদেশ ষ্টাইলে রান্না ।

আমি বললাম, এ যে বিশাল আয়োজন । আমার দুদিন লাগবে ।

- আস্তে আস্তে খাও । দেখবে ঠিক ঠিক খেতে পারছো ।

আমরা খেতে শুরু করেছি । খেতে খেতে দেখলাম, ওপাশে টেম্পলের চূড়া । চোঙা হয়ে আছে মাথাটা । মাথায় একটা বাতি ।

আমি বললাম, ব্যাংকক শহরে বুঝি টেম্পলের অভাব নেই ?

- না । চারিদিকে তুমি টেম্পল দেখতে পাবে । এদেশের মানুষেরা বুদ্ধাকে খুব মেনে চলে । এদেশের শিল্প সাহিত্য আর সংস্কৃতিতে বুদ্ধা মিশে আছে ।

আমি বললাম,

তোমাদের ধর্মে না আছে ঈশ্বর, না আছে স্বর্গ-নরক । এই ঈশ্বরহীন, স্বর্গহীন বুদ্ধাকে সকল ধর্ম থেকে আলাদা করে রেখেছে ।

- হু, বলতে পারো । আমার মা তো নিয়মিত বুদ্ধার সাথে কথা বলেন ।

আমি বললাম, সেটা কি রকম ?

শিমলা বললো,

আমার মার মনে হয় সে সব সময় বুদ্ধাকে কাছে পায় বিপদ-আপদে । এ দলে আমার মা একা নন, এ দেশের হাজার হাজার মানুষ তাদের সুখ দুঃখ বুদ্ধাকে জানায় । বুদ্ধা একটা সমাধানের চেষ্টা করেন ।

আমি বললাম,

ধর্ম আছে বলে আমরা অনেক বল পাই । যখন কোথাও কোন সমাধান খুঁজে পাই না, তখন ধর্মের মধ্যে উত্তর খুঁজতে থাকি তারপর ঠিক ঠিক জবাবটা পেয়ে যাই তারপর সেই সান্তনা নিয়ে বেঁচে থাকি ।

- যারা ধর্ম মানেন না, তারা সান্তনা কৈ পায় সাইদ ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, উত্তরটা আমার জানা নেই তবে নিশ্চয় একটা যুৎসই উত্তর আছে ।

শিমলা কিছু বললো না ।

হোটেলের ঘড়িতে রাত দশটা বাজলো । আমাদের ডিনার শেষ হয়েছে । যে তিন-চারটে ফ্যামিলি খেতে এসেছিলো ওরা ফিরে গেছে । আমরাই শুধু রয়ে গেছি ।

শিমলা বললো, আইসক্রিম দিতে বলি ?

- না । আর পারবো না, ক্ষমা করো ।

- ঠিক আছে, এই বলে কাউন্টারে গিয়ে বিল দিয়ে এলো ।

আমরা বেরিয়ে এলাম । রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা । দুধারে ঘন সবুজ গাছ আর তারি মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার রাস্তা । মনে হলো কিছুদিন হলো সুরকি বিছিয়েছে । সুরকি-সিমেন্টের ঝাঝালো গন্ধ এখনো ভেসে বেরাচ্ছে ।
শিমলা বললো, তোমার সময় হবে ?
হ্যাঁ । কেনো ?
চলো । একটু পার্কে গিয়ে বসি ।

একটু হাটতেই পার্ক চলে এলো । সারিবদ্ধভাবে গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে । কোথাও কোন ময়লা চোখে পড়লো না । প্রতিটা বসার জায়গা পরিষ্কার-ঝকঝকে । মাঝে মাঝে দুই একটা বাতি জ্বলছে আশেপাশে । সেই আলোতে কতগুলো বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি করছে । আগামী কাল ছুটি বলে অনেকেই এসেছে পার্কে । পার্কের কিছুদূর পর পর হালকা পানিয়র ব্যবস্থা । লোকজন সেখান থেকে Drinks কিনে খাচ্ছে । দুই একটা ফ্যামিলি চোখে পড়লো দূরে ।

হালকা আলো আঁধারী মাড়িয়ে দূরের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম আমরা । এখান থেকে পুরোটা পার্ক দেখা যায় । কেমন যেন নীরবতা । শিশির পড়ছে ধীরে ধীরে । আমার মনে হলো আমরা বুঝি লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি ।
শিমলা বললো, পানি খাবে ?
- ঠিক আছে, তুমি বস । আমি নিয়ে আসি ।
- না । আজ তুমি আমার মেহমান, এই বলে শিমলা দোকান থেকে পানি নিয়ে এলো ।

পানি খাচ্ছি দুজনে আর সামনে বিস্তৃত খোলা জায়গার দিকে তাকিয়ে আছি অনিমেষ নয়নে । সারাটা আকাশ নক্ষত্রে ছেয়ে আছে । আকাশে এক তিল মেঘ চোখে পড়লো না । দক্ষিণের উরু হাওয়া আমাদের নাড়িয়ে ফিরছে । মাঝে মাঝে শিমলার দীর্ঘায়িত চুলের দুই একটা আঁশ এসে পড়ছে আমার ললাটে । Sorry বলে শিমলা আগলে নিচ্ছে বার বার ।
আমি বললাম, জীবনানন্দের একটা কবিতা শোনাতে পারো ?
- কোনটা শুনতে চাও ?
- তোমার পছন্দের যে কোন একটা ।

- হাওয়ার রাত শুনবে ?

- বেশ শুনাও । এখন তো সত্যি সত্যি রাত হয়েছে ।

ঠিক আছে শোনো, এই বলে শিমলা বলতে শুরু করলো,

গভীর হাওয়ার রাত ছিলো কাল- অসংখ্য নক্ষত্রের রাত
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে ;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমি সমুদ্রের পেটের মতন,
কখনো বিছানা ছিড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে :

আমি বললাম, হাওয়ার রাত কবিতাটা কোন কাব্য গ্রন্থের ?

- বনলতাসেন কাব্য গ্রন্থের তৃতীয় কবিতা । এ কবিতাটাই বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থের প্রাণ ।

- জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্য গ্রন্থ কোনটা শিমলা ?

- ঝড়াপালক । ঝড়াপালক দিয়ে কবির যাত্রা শুরু তারপর বনলতা সেন কবিকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায় । অবশ্য ধূসর পান্ডুলিপি আর রুপসী বাংলাকে খাটো করে দেখলে ভুল হবে ।

- তোমার প্রিয় কোনটা ?

শিমলা উত্তর দিলো,

সবার আগে বনলতা সেন তারপরেই রুপসী বাংলা । রুপসী বাংলা আর বাংলাদেশের খাল, বিল, ক্ষেত একাকার হয়ে আছে । কবির মতন করে কেউ দেখেনি বাংলাদেশকে ।

আমি কিছু বললাম না ।

শিমলা বললো, একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করেছো ?

- কি শিমলা ?

- জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্র যুগের কবি হওয়া সত্বেও কেমন রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত কবিতা রচনা করেছেন । তার কবিতায় কারো পদচারণা চোখে পড়বে না । রবীন্দ্রনাথ নিজেও জীবনানন্দের প্রশংসা করতেন ।

একটু থেমে শিমলা আবার বললো,

জীবনানন্দ দাশের কবিতাগুলো পড়লে মনে হয় ও বড় দুঃখী ছিলো । দুঃখে দুঃখে কেটেছে ওর সারাটা জীবন । কি বলো ?

আমি চুপ হয়ে রইলাম অনেকক্ষণ । বললাম, হয়তোবা, ঠিক বলতে পারছি না ।

শিমলা বলতে শুরু করলো,

সুখের মধ্যে থেকে খুব কম মানুষি পেরেছে নূতন কিছু বানাতে । সুখের কাছে শিখবার তেমন কিছু নেই । সুখ সহসাই আসে আবার মরিচিকার মতন মিলিয়ে যায় । আজকের এই সভ্যতা, শিল্প ও কৃষ্টি সবই আমরা অর্জন করেছি অনেক দুঃখ, কষ্ট আর উত্তাপের মধ্যে দিয়ে । জীবনানন্দ দাশ হয়তো খুব দুঃখী ছিলেন তাই এমন জগৎ জয়ী কবিতা লিখতে পেরেছেন ।

আমি বললাম,

তাহলে তো নজরুলের কথা বাদ দিলে চলবে না । অনেক কষ্টে জীবন পার করেছে এই কবি । খেয়ে না খেয়ে জীবন কেটেছে ওর । নজরুলের গান, কবিতা এখনো আমরা শুনি ।

দুজনেই চুপ হয়ে বসে আছি । কেউ কোন কথা খুঁজে পাচ্ছি না ।

আমি বললাম, তুমি কবিতা লেখো ?

- কিছু কিছু ।

- একটা শোনাও ।

- থাক । আরেক দিন ।

আমি অনুরোধের সুরে বললাম, আজই বলো না ?

- কিন্তু তুমি হাসতে পারবে না । ঠিক?

- এই যে মুখে টেপ আটছি, এই বলে আমি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলাম ।

শিমলা হাত দিয়ে আমার হাত সরিয়ে বললো, তার দরকার হবে না । তোমাকে শোনাবো । তোমার সাথে যেদিন পরিচয়, সেদিন ছিলো আমার জন্মদিন । আমারও জন্ম হলো, তুমিও এলে ।

আমি কিছু বললাম না । চুপি চুপি বসে রইলাম । আকাশে বিস্তীর্ণ হাজারো নক্ষত্র আমাদের আলো দিয়ে চললো ।

শিমলা বললো,

শোনো তাহলে । আগেভাগে বলে রাখি এই কবিতাটা পুরোপুরি আমার নয়, জীবনানন্দের প্রভাব পুরোপুরি কাজ করছে । শুনলেই বুঝতে পারবে ।

- ঠিক আছে শোনাও ।

শিমলা বলতে শুরু করলো ।

হাজারো বৃষ্টির কণা আছড়ে পড়ছে
আমার চাড়িপাশে ।
হাজারো নক্ষত্র ঝরে পড়ছে,
আমার আঙ্গিনায় ।
সেই হাজারো নক্ষত্রের ভিড়ে আমি তোমায় খুঁজেছি,
শতাব্দী ধরে ।
তারপর একদিন তোমায় পেলাম
নীল সবুজের দেশে ।

- কেমন লাগলো সাইদ ?
- ভালো । মজার ।
শিমলা বললো,

সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি জানো ? আমি যে ভাবেই কবিতা লিখি না কেনো জীবনানন্দের ভাবধারা চলে আসে । কোন ভাবেই সেটার উর্দ্ধে গিয়ে লিখতে পারি না । আমার মনে হয় আমি একা নই । যারা জীবনানন্দের ভাবধারায় কবিতা লিখেন, তারা পুরোপুরি জীবনানন্দ প্রভাব মুক্ত হয়ে লিখতে পারেন না । জীবনানন্দ চলেই আসে ।

- হতে পারে শিমলা । হতে পারে কিন্তু মজার একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো ?
- কি সাইদ ?
- তুমি আমার দেশের কবিদের নিয়ে যতো জানো, আমি তার সিকি ভাগও জানি না । কি একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ।
- তুমি জানো না মক্কার লোকেরা হজ্ব পায় না ?
- ঠিক তাই, এই বলে আমরা দু জনে হেসে উঠলাম ।

আমি বললাম, এই জীবনানন্দ কে নিয়ে একটা মজার ঘটনা মনে পড়লো । সেবার যে কি বিপদে পড়েছিলাম । শুনবে ঘটনাটা?

- প্লিজ বলো ।

আমি বলতে শুরু করলাম,

ছাত্র জীবনে কিছু কিছু জীবনানন্দ দাশ পড়তাম । সেই সুবাদে একদিন মনে হলো আমি অনেক জেনে ফেলেছি । সেটাই কাল হয়ে দাড়ালো ।

- সেটা কি রকম ?

তবে শোনো, আমি বলতে শুরু করলাম,

জীবনানন্দের লেখা *তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে,* এই লাইনটা সকল নষ্টের মূল । তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি । একদিন আমার এক বন্ধুর বন্ধু বাসায় এসে হাজির । সে ছিলো আবার জীবনানন্দ বিশেষঙ, সে কথা আমার জানা ছিলো না । কি যেন এক প্রসঙ্গে আমি বললাম, *তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে* এই লাইনটা শিকার কবিতায় । বন্ধুর বন্ধুটি একটু আপত্তি করলো । বললো, তুমি মনে হয় কোথাও ভুল করছো, সাইদ । আমি বললাম, মনে হয় না । সেই ছেলেটা তখন কিছু বললো না তবে যাবার সময় বললো, তুমি একটু চেক করে নিও কবিতাটা । আমি মাথা নেড়ে বললাম, আমার কোন সন্দেহ নেই, আমি ঠিক বলছি । তখন আমার বন্ধুটি বললো, তোমরা দুজনে বাজি ধরলেই পারো ।

আমি বললাম, ঠিক আছে । একশত টাকা বাজি ।

বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আসা হলো । এই কাব্য গ্রন্থেই শিকার কবিতাটা দেয়া আছে । তন্ন তন্ন করে শিকার কবিতা খোঁজা হলো । *তার প্রেম ঘাষ হয়ে আসে* লাইনটা কোথাও পাওয়া গেলো না । এক শত টাকা দিতে হলো । সেই জামানায় একশ টাকা অনেকখানি বিশেষত একজন ছাত্রের জন্য তো বটেই । সেই থেকে বাজি ধরা ছেড়ে দিয়েছি ।

শিমলা শুনে অনেকক্ষণ হাসলো । হাসি থামতেই চায় না ওর । আমার মনে হলো, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ গুলো ঝুঁকে পড়েছে শিমলার হাসি শুনতে ।

শিমলা হাসি থামিয়ে বললো, তারপর কি করলে ?

- কি আর করবো ? নিজেকে শুধরাতে লাগলাম ।

-*তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে* এই লাইনটি কোন কবিতার ?

- সে তো তুমি ভালো করেই জানো শিমলা ।

- জানি । তারপরেও তোমার মুখে শুনতে চাইছি ।

আমি বললাম,

তোমার সাথে প্রথম যেদিন পরিচয়, সেদিন তুমি কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলে । কবিতার নাম আকাশলীনা ।

- ঠিক তাই, এই বলে শিমলা হেসে দিলো । বললো, আমার শিক্ষক ডক্টর লাও আবার রবার্ট হুটম্যানের ভক্ত । কথায় কথায় উনি হুইটম্যান ছাড়তেন । আমাদেরও ভালো লাগতো । হুইটম্যান নিয়ে উনার মতো বিশেষগু এই আসিয়ানে পাবে না তুমি । এই হুইটম্যান নিয়ে মজার একটা ঘটনা শুনবে ?

- বলো শুনি ।

- রবার্ট হুইটম্যানের কবিতার বই ছাপানোর পর কেউ আমলে আনলো না কিন্তু কিছু কাল যেতেই সবাই বুঝতে পারলো তার কবিতার মর্মার্থ । তখনি হাক ডাক পড়ে গেলো চারিপাশে ।

আমি বললাম, তুমি কি হুইটম্যান নিয়ে কাজ করো ?

- না । আমি কাজ করেছি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে । আমাদের একটা থিসিস লিখতে হতো ব্যাচেলার ডিগ্রীতে । আমার থিসিসের টাইটেল ছিলো: সমকালীন বাংলা সাহিত্য আর জীবনানন্দ দাশ ।

আমি বললাম, এ যে দারুণ ব্যাপার । তোমার থিসিসটা দেখতে পারি ?

- আলবৎ পারো । লাইব্রেরিতে পাবে এক কপি তবে তুমি চাইলে আমার পারসোনাল কপিটা ধার নিতে পারো ।

- বেশ ধারই দাও । একটু পড়ে দেখি ।

শিমলা হেসে দিলো । কিছু বললো না ।

|| ৫ ||

এশিয়ার অর্থনৈতিক ধস

নব্বই দশকের শেষের দিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ঘটে গেল অর্থনৈতিক ধস । এশিয়বাসীরা কখনো এত বড় ধস দেখেনি । এই ধসের শুরুটা কিন্তু থাইল্যান্ডে, Land of Smiles এর দেশে । থাইল্যান্ড এমন একটা দেশ যা কখনো পাশ্চাত্যের কলনিতে পরিণত হয় নি অথচ আশেপাশের দেশ গুলো কোন না কোন ভাবে পাশ্চাত্যের অধীন ছিলো । থাইল্যান্ডের চারিধার জুড়ে আছে মালয়শিয়া, লাওস, মায়ানমার আর কম্বোডিয়া । এর মাঝে চিতল মাছের মতন লম্বা হয়ে শুয়ে আছে থাইল্যান্ড । হাসি খুশির দেশ ।

হাসিখুশির দেশ আর হাসিখুশি রইলো না । থাইল্যান্ডে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক ধস দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের দেশগুলোতে । সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয় আসিয়ান পরিবারের সদস্যরা । দশটি দেশ নিয়ে আসিয়ান পরিবার, যেমন মালয়শিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ইন্দিনেশিয়া, ব্রুনাই, লাওস, ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া । এই অর্থনৈতিক ধস একদিনে আসেনি । দীর্ঘদিন ধরে পুন্জীভুত হচ্ছিল ধসের বীজ । তারপর মেঘ এতো ভারী হলো যে শুর শুর করে নেমে এলো বৃষ্টি । শুরু হলো এশিয়ার ক্রান্তিকাল । একদিন যাদেরকে Asian Tiger বলা হতো, তারা পরিণত হলো চুপসে বিড়ালে ।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়েছিলো ইংল্যান্ডে । তারপর তা ছড়িয়ে পরে সারা ইউরোপে । যেহেতু ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে দেনা-পাওনা, আদান-প্রদান চলতো নিরন্তর, তাই এই বিপ্লবের বিস্তার ঘটতে একদমি সময় লাগে নি । রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ে এই বিপ্লব সারা ইউরোপ জুড়ে । ঠিক একই ভাবে থাইল্যান্ডে উদ্ভুত অর্থনৈতিক ধস ত্বরিত বেগে ছড়িয়ে পরে আসিয়ান পরিবারে । শুরু হয় অর্থনৈতিক দোদুল্যতা ।

আশির দশকের গোড়া থেকে নব্বই দশকের শেষ অবধি আসিয়ানদের পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি । চারিদিকে শুধু জয় জয়কার । ঝাড়া এই সতর বছর ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে আসিয়ানরা একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে গেলো । শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর বাসস্থান এই তিন মৌলিক চাহিদা প্রায় সকলের নাগালের মধ্যে চলে আসে । মানুষের আয় বেড়ে যায় হু হু করে । জীবন যাত্রার মান আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেড়ে একটা ভাল যায়গায় অবস্থান নেয় ।

তবে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে চলে যায় সিঙ্গাপুর । শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিঙান খাতে আসিয়ানদের ডিঙিয়ে ইউরোপিও স্তরে উন্নীত হয় সিঙ্গাপুর । আজো তারা সেই স্তর ধরে রাখতে পেরেছে । এখন প্রশ্ন হলো আসিয়ানরা কিভাবে ভাগ্য ফেরালো ? কিভাবে বাড়ালো জীবনযাত্রার মান ? ব্যাপক বৈদেশিক বিনিয়োগ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, শিক্ষা খাতে বিপুল বরাদ্ধ, বিনিয়োগ বান্ধব নীতি, নিজেদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার আসিয়ানদের ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করলো ব্যাপক ভাবে । কিন্তু হঠাৎ করে আসা অর্থনৈতিক ধস সব অর্জনকে ম্লান করে দিয়েছিলো ।

অর্থনৈতিক ধসের কারণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত । কেউ কেউ বলেন, আসিয়ানদের অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় স্বল্প অভিঙতা, তাদেরকে এই ধসের মধ্যে ফেলে দেয় । আবার অনেকে বলেন, আসিয়ানরা খুব চটজলদি তাদের অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো বিশ্ব বাজারে যা শেষমেষ সামাল দিতে পারে নি ওরা । ইউরোপের সোভিয়েত ইউনিয়ন আর এশিয়ার আসিয়ানরা তাদের অর্থনীতি খুব তাড়াতাড়ি উন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজেরাই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ।

আজকের চিন কিন্তু আসিয়ান আর সোভিয়েত ইউনিয়নের তিক্ত অভিঙতার আলোকে তাদের নীতি সাজিয়েছে । চিনারা তাদের অর্থনীতি শম্ভুক গতিতে উন্মুক্ত করছে যেন তাদের দেশ সেই উন্মুক্ত নীতির সাথে খাপ খাইয়ে এগিয়ে যেতে পারে । ফলে চিনাদের কোন অর্থনৈতিক ধসের মধ্যে পড়তে হয়নি । Slow and steady win the race, এই আদর্শে বলীয়ান হয়ে ওরা এগিয়ে যাচ্ছে । ফলে চিন আজ বিশ্বের উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশ ।

অনেকে বলে থাকেন, সারাটা নব্বই দশক জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার বাড়িয়েছে । ফলে আমেরিকানদের Financial Asset কিনলে চড়া শুদ পাওয়া যেতো । এই অতি মুনাফার আকর্ষণে বিনিয়োগ চলে যায় আমেরিকার দিকে । ফলে দক্ষিণ এশিয়াতে মূলধনের ঘাটতি দেখা দেয় যা আসিয়ানদের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় ।

কেউ কেউ আবার বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে চিনের উত্থান এই ধসের মূলে কাজ করেছে । সস্তা দ্রব্য আর সেবা সরবরারহ করে চিনারা আসিয়ানদের রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক ভাগ বসায় । ফলে আসিয়ানদের ব্যবসা বাণিজ্য পড়ে আসে । শুরু হয় অর্থনৈতিক ধস ।

তবে আশার কথা হলো নব্বই দশকে ঘটে যাওয়া অর্থনৈতিক ধস আসিয়ানরা কাটিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে । আসিয়ান পরিবারে উৎপাদন বেড়ছে, বেড়েছে অর্থনৈতিক গতি আর যারা চাকরি খুইয়েছিলেন, তারা কাজ খুঁজে পেয়েছে । আসিয়ানরা এখন মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলেছে । আশা করা যায় আগামী দশকে এই ধসটা মিলিয়ে যাবে পুরোপুরি । আবার আসিয়ানরা Tiger এ পরিণত হবে । অর্থনৈতিক ধসের দুঃস্বপ্নটা মিলিয়ে যাবে চিরতরে ।

।। ৬ ।।

সাদিকা

ব্যাংকক শহরের উপর দিয়ে চাও ফ্রেয়া নদী বয়ে গেছে । এই নদীকে ঘিরে শহরের কর্মকান্ড চালিতো হয় । শিমলাদের বাড়ি থেকে চাও ফ্রেয়া নদী খুব কাছে । দশ মিনিট লাগে নদীর ঘাটলায় যেতে ।

আজ রবিবার, ছুটি ছাটার দিন । শিমলা ওর বাসায় দাওয়াত করেছে । লান্চ খাবো ওদের সাথে । শিমালা পরিচয় করিয়ে দেবে ওর মার সাথে ।

দুপুর বেলায় শিমলার প্রকান্ড গাড়িটা এসে দাঁড়ালো হোটেল চত্বরে তারপর আমাকে নিয়ে ছুটলো শিমালাদের বাসায় ।

আধঘন্টা যেতেই শিমলাদের বাড়ি পৌছানো গেলো । ছুটির দিন বলে রাস্তায় ট্রাফিক কম । হেলে দুলে গাড়িটা এসে ঢুকলো শিমলাদের বাড়ির আঙ্গিনায় ।

শিমলা ও তার মা ট্র্যাডিশনাল থাই ড্রেস পড়েছে, ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা । লাল-নীল অনেক রঙে ঢাসা ড্রেসটা । জাপানি ড্রেসের সাথে অনেক মিল খুঁজে পেলাম, সাধারণত কোন অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে পড়ে ওরা ।

গাড়িটা শিমলাদের বাড়িতে ঢুকতে প্রথমে চোখে পড়লো বিশাল বাঙলো । কাঠ আর বাঁশ দিয়ে বানানো । পরিস্কার ঝক ঝক করছে সামনের দিকটা । সামনে প্রসস্ত বাগান, তারপরে বাঙলো । ডানদিকে একটা ফোয়ারা নিরন্তর পানি উঁড়িয়ে চলেছে ।

বাড়ির বারান্দায় দেখলাম শিমলা ও তার মা দাঁড়িয়ে আছে । আমি গাড়ি থেকে নামতে ওরা মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করলো, সাদিকা । আমিও মাথা ঝুঁকিয়ে দিলাম ।

শিমলা আমাকে ওর মার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো ।

ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে কিন্তু তা বুঝবার যো নেই । হেসে দিলেন ভদ্রমহিলা । এক সময়ে যে সুন্দরি ছিলেন, চোখের তারায় ফুটে উঠেছে সে কথা । আমাকে বললো, তোমার কথা অনেক শুনেছি শিমলার কাছে । আমি খুব খুশি হয়েছি তুমি আমাদের বাসায় এসেছো, ভেতরে এসো ।

কাঠের আসবাব দিয়ে সাজানো বসার ঘরটা । এদিকে একটা ঝার বাতি ঝুলে আছে উপর থেকে । দেয়ালে বাঁশের নকশা ।

কঠের সোফায় গা এলিয়ে বসলাম । শিমলা বললো, রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় নি তো ?

- না । একটানে চলে এসেছি ।

- ছুটির দিন বলে তাড়াতাড়ি আসতে পেরেছো । আজ থেকে পনর বছর আগে হলে পারতে না । তখন ব্যাংকক শহরে গাড়ি নিয়ে বের হলে খুব মুশকিলে পড়তে হতো । এখন ফ্লাই ওভার করাতে ট্রাফিক কিছুটা কমেছে ।

একটু পরে শিমলার মা এলো, বললো, তোমার নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে । দুপুর তো গড়িয়ে যাচ্ছে, চলো খেতে বসি ।

পাশেই ঘের দিয়ে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে । একজন বেয়ারা এসে দাঁড়ালো । বয়স বিশের উপরে নয় । শিমলা বললো,

আমরা সব ভেজিটেবল আইটেম করেছি । আশা করি তুমি Enjoy করবে । এই আইটেমগুলো আমি আর মা রেঁধেছি । তুমি নির্ভয়ে খেতে পারো ।

আমি বললাম, ঠিক আছে, অসুবিধে নেই । ধন্যবাদ ।

শিমলার মা বললো, তোমার দেশে কে কে আছে ?

- বাবা-মা নেই । ভাই বোনেরা আছে । ওদের সব বিয়ে হয়ে গেছে ।

- তাহলে তো তুমি একায় পড়েছ । তোমার বয়সে আমিও বাবা-মা হারিয়ে ছিলাম ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

- মালয়শিয়া তে কতদিন ধরে আছো ?

- বছর তিনেক ।

- খুব ভালো । প্লিজ খাবার তুলে নাও । শিমলা কে বললো, সাইদকে তুলে দাও ।

- ধন্যবাদ, আমি নিজেই নিচ্ছি, এই বলে ভাত আর ফুলকফির ভাজি তুলে নিলাম ।

আমরা খেতে শুরু করেছি ।

শিমলার মা বললো, এখানে তোমার খাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে না তো ?

- প্রথম প্রথম হয়েছিলো পরে শিমলা ভাল হোটেল দেখিয়ে দেয় । ওখান থেকে কিনে খাই । একেবারে বাংলাদেশের মতন রান্না ।

- তোমরা কি রান্নায় খুব Spice দাও, সাইদ ?

- অনেকে দেয় । আমার মা দিতেন না । বলতেন যত টাটকা খাওয়া যায় ।

শিমলার মা বললেন, ধরতে গেলে আমরা কোন Spice দেই না । হালকা জ্বালে লবন দিয়ে সেদ্ধ করে ফেলি ।

শিমলা বললো, খেতে পারছো তো সাইদ ?

আমি হেসে বললাম, কোন অসুবিধে দেখছি না । বাংলাদেশের রান্নার সাথে কোথায় যেন মিল ।

শিমলার মা বললো, দেশে যাওয়া পড়ে তোমার ?

- এখন তো বাবা-মা নেই তাই যাওয়া হয় না । তবে মাঝে মধ্যে যাই ছুটি ছাটায় ।

খাওয়া শেষ করে চা নিয়ে বসেছি । তখনো বিকেল শুরু হয়নি । বাইরে সূর্যের আলো ম্লান হয়ে এসেছে । আগের মতন টগবগে ভাবটা নেই । কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে ।

শিমলা এসে পাশে বসলো ।

- এই বার বলো আমার মা কে কেমন লাগলো ?

- চমৎকার মহিলা । মনে হয় বাংলাদেশের কোন মা ।

শিমলা বললো,

আমরা এশিয়ানরা একই রকম । খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়ে না । আমরা এদেশে অনেক কিছু মানি যে গুলোর কোন ভিত্তি নেই । নিশ্চয় তোমরাও অনেক কিছু মেনে চলো ।

আমি হেসে বললাম,

সে সবের কোন অভাব নেই বাংলাদেশে । যেমন, সকালে সকুলে বের হবার পথে ধাক্কা খেলে মা বলতেন, বাবু, একটু বসে যা । না হলে রাস্তায় বিপদ হতে পারে । আবার খেতে খেতে গলায় ঠেকে গেলে আমরা ভাবি কেউ বুঝি আমার কথা ভাবছে ।

শিমলা হেসে বললো, এ সবের ঘাটতি এ দেশেও তুমি পাবে না ।

আমি বললাম,

ভাবছি আমরা এশিয়ানরা এক রকম হলাম কি করে ? পাশ্চাত্য বিশ্বের লোকজন কিন্তু এতো কিছু মেনে চলে না । কোথাও ধাক্কা খেলে একটু বসে যায় না । ওরা হেঁটে যায় । আমার মনে হয় এশিয়ানদের প্রচন্ড ধর্মীয় অনুভূতি আমাদের এক কাতারে `\o করিয়ে দিয়েছে ।

আমার কথা শেষ হতে শিমলা বললো, দাঁড়াও, তোমার জন্য চা নিয়ে আসি । একটু বসো ।

আমি কিছু বললাম না ।

ধীরে ধীরে বেলা পরে আসছে । হালকা আলো ছায়া খেলা করছে সামনের বাগানে । আর এক ঘন্টার মধ্যে সূর্য ডুবে যাবে ।

শিমলা উঠে দাঁড়ালো । চল নদীতে ঘুরে আসি ।

- কোথায় নদী ?

- এই তো একটু পশ্চিমে । এই নদী ব্যাংককের প্রাণ । এর ধার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে নগরী । চলো দেখবে ।

- চলো, শিমলার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলাম ।

ISBN No. 978-983-43934-2-7

চাও ফ্রেয়া নদী

ব্যাংকক শহর চিড়ে বয়ে গেছে চাও ফ্রেয়া নদী । এই নদীর পাড়ে গজিয়ে উঠেছে ব্যাংকক নগরী । কিছুদূর পর পর ব্রীজ, এই ব্রীজ দিয়ে দু-পারের যোগাযোগ রক্ষা হয় ।

অনেক পুরোনো এই চাও ফ্রেয়া । দেশের শিল্প, সাহিত্য আর সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে এই নদী । নদীর দুই ধারে গড়ে উঠেছে ব্যবসা-বাণিজ্য, হোটেল- মোটেল ও আবাসিক ঘর-বাড়ি ।

নৌকা ভাড়া করে আনলো শিমলা । মাথার দিকটা চোঙা, দেখতে সাপের মতন, তিরতির করে বয়ে চলে ।

- উঠে বসো সাইদ ।

আমি মাঝে গিয়ে বসলাম । নৌকোর ধার ঘেষে বসেছে শিমলা । তখন সবে মাত্র সন্ধ্যে নামছে । নদীর ঘাটলয় আলো জ্বলতে শুরু করেছে । আমাদের নৌকা এগিয়ে চলেছে মাঝ-নদী বরাবর । ঠিক হয়েছে ঘন্টা খানেক ঘুরে আবার ফিরে আসবো নদীর ঘাটলায় ।

- তোমার শীত করছে, সাইদ ?

- না ।

- এখন শীত না করলেও ঘন্টা খানেক পরে করবে ।

- তাই নাকি ?

- হু । সেজন্য বাসা থেকে চাদর এনেছি । শীত লাগলে বোলো ।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম ।

দেখতে দেখতে নদীর মাঝে চলে এসেছি । ঘাটলার বাতিগুলো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এলো । অন্ধকার নেমে এসেছে নদী-বক্ষে । আকাশে আজ চাঁদ উঠেনি, তাই নক্ষত্রের আলো আরো ধারালো হয়ে উঠলো । আমার মনে হলো হাজারো জোনাকি, হাজারো ফানুস হয়ে আকাশের নিভৃতে আলো বিছিয়ে দিয়েছে ।

শিমলা বললো, তোমার সবচেয়ে কি ভাল লাগে ?

আমি হেসে বললাম, কেন ?

- বল না শুনি ।

আমি বললাম,

সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছরে পড়া সমুদ্রের ঢেউ দেখতে ভাল লাগে । তখন মনে হয় এ এক অচেনা পৃথিবী । পৃথিবীর মাঝেই আরেক পৃথিবী ব্যাপৃত হয়ে আছে ।

- এই অচেনা পৃথিবীটা কি সাইদ ?

আমি হেসে বললাম,

যখন প্রতিটা আছরে পড়া ঢেউয়ের মধ্যে নূতন পৃথিবী দেখি, তখন আগের পৃথিবী পুরোনো মনে হয় । মনে হয় খুব অচেনা ।

- তোমরা কি সবাই এ রকম নাকি সাইদ ?

- যেমন ।

শিমলা বলতে লাগলো,

তোমরা যেন কেমন উরুউরু, হাসিবকেও দেখেছি উরুউরু । হাসিবের সাথে থেকে শেষের দিকে আমিও উরুউরু হয়ে গিয়েছিলাম ।

- উরুউরুই থাকতে ?

শিমলা বললো,

আমার ক্যারিয়ার গড়ার শখ ছিলো তাই উড়ুউড়ু থেকে বেরিয়ে আসি কিন্তু মাঝে মধ্যে মনের ভেতর ডাক পড়লে তখন আবার উড়ুউড়ু হয়ে যাই । দু এক লাইন কবিতা লিখি তারপর মনে এসে ভর করে ধানসিড়ির কথা । এই ধানসিড়িটা কি সাইদ ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম । কি জবাব দেবো ভেবে পাচ্ছি না । বললাম,

আমি বলতে পারছি না । বরন্চ তুমি বাংলাদেশে ঘুরে যাও । আমাদের অনেক জীবনানন্দ বিশেষঙ আছে, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবে ।

- যাবো নিশ্চয় যাবো । হাসিবের সাথে যেতাম কিন্তু ও তো বিয়ে থা করে আমেরিকা চলে গেলো ।

- বাংলাদেশে গিয়ে কি দেখবে ?

- ধানসিড়ি, গাঙচিল, নক্ষত্রের রাত, বিদর্ভ নগরী, বনলতা সেন, গভীর হাওয়ার রাত আর দারুচিনি দ্বীপ ।

আমি হেসে বললাম,

আদৌও এসবের অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহ । বেশিরভাগি কবির কল্পনা তারপরেও তুমি চেষ্টা করতে পারো ।

- সে চেষ্টা করতেই তো যাবো ।

আমি বললাম, তাহলে তো তোমার মধ্যে উড়ুউড়ু পুরোটাই আছে ?

শিমলা হেসে বললো,

আমাদের এই পুরো দেশটাই তো উড়ুউড়ু । তুমি দেখনা টেম্পলের পুরোহিতরা কেমন গেরুয়া পড়ে ঘুরে বেড়ায় । ঘর-সংসার ছেড়ে টেম্পলে পড়ে থাকে দিনের পর দিন । এদেরকে আমরা Monk বলি ।

- হ্যাঁ রাস্তা ঘাটে প্রায় দেখি । টেম্পলে দেখেছি । এদের কাজটা কি শিমলা ?

- নিজেকে পরিশুদ্ধ করা আর সেই পরিশুদ্ধ করতে নিজেরা গভীর সাধনায় মগ্ন থাকে । কোন মেয়েছেলে ওদের স্পর্শ করবে না । থাইবাসীরা Monk দের সম্মান করে চলে ।

একটু থেমে শিমলা আবার বলতে শুরু করলো, এ দেশের জনসংখ্যার নব্বই ভাগ বৌদ্ধ মতে আছে । এদের সবাইকে জীবনের কোন না কোন এক সময়ে Monk হয়ে থাকতে হয় স্বল্পকালের জন্য । আমাদের রাজা রামা নাইন কিছুকালের জন্য Monk হয়ে ছিলেন ।

আমি বললাম,

প্রাচীনকালে এই Monk রাই ছিলো পৃথীবির শিক্ষক । ভারতীয় Monk দের কাছে শিক্ষা নিতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসতো । অনেকে আবার ভারতে থেকে যেতো বছরের পর বছর ।

শিমলা বললো,

অনেকে বলে, বৌদ্ধ ধর্ম আসলে কোন ধর্ম নয় কারণ ধর্ম হতে গেলে অনেক কিছু লাগে যেমন, ঈশ্বর, স্বর্গ-নরক, দেব-দেবী কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে সে সবের বালাই নেই । এ হলো একটা জীবন-দর্শন । অহিংস পথে চলার পাথেয়, দুঃখময় জীবন থেকে পরিত্রাণের উপায় । যখনি তুমি নির্বাণ লাভ করলে, সকল দুঃখ থেকে মুক্তি পেলে ।

আমি বললাম, তুমি একটি ব্যাপার খেয়াল করেছো ?

- কি ?

- বৌদ্ধ ধর্ম এমন একটা ধর্ম যা প্রতিষ্ঠা করতে কোন যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি । এমনি এমনি দাঁড়িয়ে গেছে । বর্তমান বিশ্বের বড় একটা অংশ এই বৌদ্ধ মতে আছে ।

- এর কারণ কি জান সাইদ ? এর কারণ হলো বৌদ্ধ মতের সাথে অন্য ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসে কোন বিরোধ নেই তাই সব ধর্মের সাথে বৌদ্ধ দর্শন মানিয়ে চলতে পারে । দ্বীতিয়ত, বুদ্ধ ধর্মের মূলে যে অহিংস নীতি আছে, তা বৌদ্ধদের ধর্ম যুদ্ধে যেতে বার বার নিরুৎসাহিত করেছে ।

আমি বললাম, আসলে গৌতম বুদ্ধা কি বলতে চেয়েছেন ?

শিমলা হেসে বললো, কেন ? বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহন করবে নাকি ?

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

শিমলা বলতে শুরু করলো,

বুদ্ধ দর্শনের প্রথম কথা হলো মানব জীবন মাত্রই দুঃখময় আর সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় বের করতে হবে । তুমি তো জানো গৌতম বুদ্ধ রাজার ছেলে ছিলো । সে দেখতো প্রাসাদের চারিপাশে বাস করা মানুষদের দুঃখ আর হাহাকার । মানুষদের এই দুঃখ গৌতম বুদ্ধকে তাড়িয়ে ফিরতো তাই এই দুঃখের কারণ আর প্রতিকার বের করতে তিনি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন । এভাবে অনেক দিন কাটলো তারপর কোন এক পূর্ণিমা রজনীতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন । যখনি বুদ্ধত্ব এলো, মানুষের দুঃখের কারণ আর প্রতিকারের উপায় অজানা রইলো না ।

আমি বললাম, মানুষের দুঃখের কারণ কি ?

- অঙতা । আমাদের অঙতা, আকাঙ্ক্ষা, হিংসা সমস্ত দুঃখের কারণ ।

আমি বললাম, এইবার বলো এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ?

- নির্বাণ । তোমাকে নির্বান লাভ করতে হবে তবেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে । - এই নির্বাণটা কি ?

- এ এক জটিল ব্যাপার । আমি ব্যাখা করতে পারবো না ।

- তারপরেও চেষ্টা করে দেখো না ? আমি তাড়া দিলাম ।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,

সম্ভবত নির্বাণ হলো একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি, যা ব্যক্ত করা যায় না । এটা উপলদ্ধির ব্যাপার । সম্ভবত যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন, তারপক্ষেও বলা সম্ভব হবে না তবে ভেতরে ভেতরে উপলদ্ধি করা যাবে শত ভাগ, এই বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো ।

আমি ডাকলাম, শিমলা ।

- হু । বলো ।

- চেষ্টা করে দেখো না নির্বাণের আরো কোন ব্যাখা দিতে পারো কি না?

- তুমি তো দেখছি নাছোরবান্দা ?

- বলতে পারো । এই স্বভাবটা আমার ছেলেবেলা থেকে, অর্ধেক শুনে শান্তি পাই না ।

- ঠিক আছে শোনো । এই আমি চেষ্টা করছি ।

- বলো ।

শিমলা বলতে শুরু করলো,

নির্বাণ হলো মনের একটা অবস্থা বা বলতে পারো জ্ঞানের সর্বশেষ স্তর । এই স্তরে যখনি তুমি পৌছলে, তোমার চারিপাশের ব্যাপার গুলো লুপ্ত হলো । তুমি গভীর আমানিষায় হারিয়ে গেলে ফলে দুঃখ, বেদনা, হতাশা, হিংসা তোমা থেকে মিলিয়ে গেলো । তুমি মুক্ত হয়ে গেলে সব কিছু থেকে, এই বলে শিমলা হেসে বললো, বাকীটা কোন Monk কে জিঙাসা করে নিও ।

আমি বললাম, এই নির্বাণ লাভের জন্য আমাদের কি কি করতে হবে ?

- এক কথায় বলবো ?

- বলো ।

- নিজের অহংকে পরাভূত করতে হবে । লোভ, লালসা আর হিংসা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে । এর জন্য দরকার ঙান । জীবন চলার পথে ঙানকে করতে হবে নিত্যসাথী, দেখবে তুমি নির্বাণ লাভ করেছো । যখনি নির্বাণ এলো, দেখবে তুমি আর তুমিতে নেই । অন্য সত্বায় হারিয়ে গেছো । এ এক দুঃখহীন, হতাশা মুক্ত স্বর্গ ।

আমি হেসে বললাম, তোমাকে ধন্যবাদ এতো সব বলার জন্য । তুমি কি নির্বাণ লাভের চেষ্টা করো ?

- তা ঠিক করি না কারণ ব্যাপারটা জটিল আর এইটে অর্জনে অনেক ছাড় দিতে হয় তবে চেষ্টা করি অহিংস পথে চলবার যেন আমার দ্বারা কোন মানুষ বা প্রাণীর ক্ষতি না হয় ।

আমি বললাম,

এই অহিংস পথটাই সবচেয়ে সেরা । ভারত উপমহাদেশে মহাত্মা গান্ধি এই অহিংসতার পথে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন ।

শিমলার কথাটাই ঠিক হলো । দেখতে দেখতে শীত এসে আকড়ে ধরলো । নদীর ঠান্ডা হাওয়ায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে । শিশির পড়তে শুরু করেছে সারা নদী জুড়ে । ঘড়িতে দেখলাম রাত এগারটা । আমরা নদীর মাঝ দিয়ে বেয়ে চলেছি । কাল ছুটি ছাটা তাই বাড়ি ফিরবার তাড়া বোধ করছি না । শিমলা বললো, এই নাও চাদর । জড়িয়ে বসো, এই বলে ধূসর রঙের চাদর বাড়িয়ে দিলো ।

আমি হাতে নিতেই চাদরটা গড়িয়ে পড়লো আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে । কি মিহি করে বুনেছে ওরা । চাদরের চারিধারে কালো সুতোর কাজ । মাঝখানে গোলাকার ফুল ।
আমি হেসে বললাম, কই থেকে এনেছো ? এ যে মিহি ধানের চেয়েও নরম । - ভারত থেকে এনেছে আমার বোন । ভারতীয়রা খুব ভালো হাতের কাজ জানে । দেখ না কি সুন্দর করে বুনেছে ?
- আসলেই সুন্দর, এই বলে আমি কয়েকবার নেড়েচেড়ে দেখলাম ।
শিমলা বললো, বাংলাদেশ তো নদী নালার দেশ । তোমরা এভাবে নদীতে ঘুরে বেড়াও না ?
আমি বললাম,

সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি । আমাদের নদীগুলো বিরাট বিরাট, বিশেষ করে বর্ষাকালে ওদের চেহাড়া পাল্টে যায় । কেমন যেন সাগরের রুপ নেয় । তখন ভয় ভয় লাগে । আবার শীতকালে ছোট হয়ে আসে, চুপসে যায় দুই পাড় । তারপর বললাম, একবার আসো না বাংলাদেশে ? বাংলাদেশের নদী, নালা, খাল, বিল তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাবো ।
- যাবো, নিশ্চয় যাবো । জীবনানন্দ দাশের টানে হলেও যাবো । শিমলার কথা শেষ না হতেই আকাশে একটি তারা খসে পড়লো ।
শিমলা বললো, দেখেছো কেমন তারা খসে পড়ছে ?
আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।
- ব্যাংককের আকাশে প্রায় তারা ঝরে পড়ে । তোমাদের দেশে তারা ঝরে পড়তে দেখেছো ?
- অনেক দেখেছি তবে গ্রাম দেশে বেশি দেখা যায় ।
- বল না শুনি ?
ঠিক আছে শোনো, এই বলে আমি বলতে শুরু করলাম,

মাঝে মাঝে গ্রামের মাঠে বসতাম আমরা । সারারাত গল্প হতো । শীতকাল বলে ছোট্র একটু আগুন জ্বালিয়ে নিতাম যেন শীতের প্রকোপটা কমে আসে । রাতভর শিশির পড়তো মাঠে ।

মোটা শক্ত চাদরে মাথা ঢেকে বসে থাকতাম আমরা । তখন দেখতাম তাড়া খসে পড়ছে আকাশ থেকে ।

আমার কথা শেষ হতেই শিমলা বলে উঠলো,

হিমের রাতে শরীর উম রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে -
মোরগফুলের মতো লাল আগুন ;
শুকনো অশত্থ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের ;

আমি বললাম, জীবনানন্দ দাশ থেকে বললে ?

- হু, বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো ।

রাত অনেক হয়ে এলো । শিমলার গাড়িটা আমাকে হোটেলের মুখে নামিয়ে ফিরে গেছে । আমি সিড়ি বেয়ে হোটেলের লবিতে উঠছি আর ভাবছি শিমলার কথা, এক ভিনদেশী মেয়ের কথা যার সারা অন্তর জুড়ে বাংলাদেশের এক কবি ছায়া ফেলে রেখেছে ।

© Ramader Deshe, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

॥ ৮ ॥

Chulalongkorn University

ব্যাংককের মাঝেই এই Chulalongkorn ইউনিভার্সিটি । রাজা Chulalongkorn এর নামে এই ইউনিভার্সিটি করা । রাজা Chulalongkorn রামা-ফাইব নামে পরিচিত । অনেক গুলো ফ্যাকাল্টি আছে Chulalongkorn এ । আমার হোটেল থেকে গাড়ি চালিয়ে অনায়েসে পৌঁছে যাই ইউনিভার্সিটিতে ।

এই Chulalongkorn এ পড়াতে এসেছি তিন মাসের জন্য । দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেলো । আজ শেষ ক্লাস, এর পর আর আসা হবে না । আগামী সপ্তাহে মালয়শিয়া ফিরে যাচ্ছি । Monetary Economics এর শেষ চ্যাপ্টার টা পড়ালাম আজ । পড়ানো শেষ হয়েছে, এক ছেলে উঠে দাঁড়ালো । বিনয়ের সাথে বললো,

- তুমি তো চলে যাচ্ছ । যাবার আগে আমাদের কিছু বলো ?

- কি জানতে চাও ?

- যা ইচ্ছে ।

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, তোমরা যদি specific কোন বিষয়ে জানতে চাইতে, আমার জন্য সুবিধে হতো ।

তখন এক মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো, তোমার দেশ নিয়ে কিছু বলো ?

- বাংলাদেশ নিয়ে ?

- হু ।

- কি জানতে চাও ?

- বাংলাদেশের সীমানা, অবস্থান এই সব ?

ঠিক আছে, এই বলে বলতে শুরু করলাম,

বাংলাদেশ হলো দক্ষিণ এশিয়ার এক দেশ । ছোট্ট দেশ অথচ মানুষ দিয়ে ঠাসা আর সেটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা । কোন ভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঠেকিয়ে দেয়া যাচ্ছে না । ঢাকায় এলে দেখবে কেমন মানুষে ভরা, এই বলে থেমে গেলাম ।

তারপর আবার বলতে শুরু করলাম,

বাংলাদেশের তিন পাশ জুড়ে আছে ভারত । দক্ষিণে বয়ে চলেছে বঙ্গোপসাগর । যেহেতু ভারত আমাদের সীমান্তে দাঁড়িয়ে, তাই ভারতের সাথে আমাদের ভাগ্য নানা ভাবে জড়িয়ে আছে । বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের আবাস এই ভারতে ।

- ভারত তো পরমাণু শক্তিধরও ? একজন বলে উঠলো ।

- হু । আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । বললাম, ভারত একা নয়, পাকিস্তানও পরমাণুর খাতায় নাম লিখিয়েছে ।

ছেলেটা বললো, চির শত্রু দুই দেশের মধ্যে পরমাণুর যুদ্ধ বাধলে উপমহাদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, কি বলো ?

আমি বললাম,

মনে হয় না নূতন করে যুদ্ধ বাধবে কারণ ওরা জানে পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা । তবে সত্যি সত্যি যদি যুদ্ধ বেধে যায়, পরমাণুর আগুনে জ্বলে পুরে ছাই হয়ে যাবো আমরা । মুছে যাবে ভারত উপমহাদেশের নাম পৃথীবির মানচিত্র থেকে ।

- তোমরা SAARC এর মাধ্যমে একটা সুরাহা করতে পারো না ?

আমি হেসে বললাম, না, SAARC সেই পর্যায়ে নেই ।

- কেন বলো তো ?

আমি বলতে শুরু করলাম,

SAARC হয়েছে অনেক বছর হলো কিন্তু তার সুফল আজও আসে নি । SAARC এগুতে পারছে না নানা কারণে । যেমন : ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মির ইস্যু নিয়ে জিইয়ে থাকা বৈরি ভাব, সদস্য দেশ গুলোর মধ্যে পারস্পারিক আস্থার অভাব আর আভ্যন্তরীন রাজনীতিতে অস্থিশীলতা, SAARC কে স্থবির করে রেখেছে । তবে চেষ্টা চলছে কিভাবে এই SAARC কে কার্যকরি করা যায় ।

- নিজেদের মধ্যে এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে তোমরা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছো ?

আমি বলতে শুরু করলাম,

পারস্পারিক আস্থা ফিরিয়ে আনা চারটি খানি কথা নয় । এই অনাস্থার ভিত অনেক গভীরে তারপরেও চেষ্টা চলছে । সদস্য দেশ গুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক দলের আদান-প্রদান, আন্তদেশীয় খেলাধুলা, সড়ক পথে যাতায়াত, এসবের মধ্যে দিয়ে সম্পর্ক জিইয়ে রাখার চেষ্টা চলছে । তবে যতদিন না পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছাটা জাগবে, ততদিন SAARC মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে ।

এক মেয়ে বলে উঠলো,

সম্ভবত এই শক্ত কাজটি করার দায়িত্ব শক্তিধর দুই দেশ ভারত আর পাকিস্তানের উপরে বর্তায় । যেমন : ইউরোপিয় ইউনিয়নের কথাই ধরো না । ফ্রান্স আর জার্মানী, শক্তিধর এই দুই দেশ ইউরোপিয় ইউনিয়নে ঐক্য বজায় রেখেছে । মুরুব্বীরা যদি মিলেমিশে থাকে, পরিবারে শান্তি আসবে সেটাই স্বাভাবিক ।

আমি কিছু বললাম না ।

এক মেয়ে বললো, আমাদের এই আসিয়ানের কোন দুর্বলতা তোমার চোখে পড়েছে ?

আমি বললাম,

এদের সবচেয়ে বড় অসুবিধে হলো, আসিয়ানদের কেউ গনতন্ত্রমনা, কেউবা সামরিক জান্তা আবার অনেকে রাজা-বাদশাহ । এই ভিন্ন মতের কারণে আসিয়ানদের অনেক অসুবিধেয় পড়তে হয় ।

এক ছাত্র দাঁড়িয়ে বললো,

এর পাশাপাশি রয়েছে ধর্মের বিভেদ । কেউ ক্রিশ্চান, কেউবা মুসলিম আবার অনেকে বৌদ্ধ । এই ধর্মের বিভিন্নতা একটা বাধা । ইউরোপিও ইউনিয়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলো সবাই ক্রিশ্চান । এই ধর্মীয় একাত্মতা অনেক মত পার্থক্য দূর করতে সাহায্য করে ইউরোপিওদের ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম ।

একটা শুকনো মতন ছেলে বললো,

এবার গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে কিছু বলো ?

আমি বলতে শুরু করলাম,

গ্রামীণ ব্যাংক মূলত দরিদ্র পল্লিবাসীর ব্যাংক । এই ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে কোন বন্ধকের প্রয়োজন পড়ে না । অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো বন্ধক ছাড়া ঋণ দিতে চায় না ফলে যাদের

সহায়-সম্পত্তি নেই, তারা ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে না ফলে গরিব গরিবই থেকে যায় । এই গ্রামীণ ব্যাংক গরিব মানুষদের পুঁজি দিয়ে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেছে ।

- এই গ্রামীণ ব্যাংক আদলে আরো ব্যাংক গড়ে তোলা যায় না ? কেউ একজন পাশ থেকে জানতে চাইলো ।

আমি বললাম,

পৃথীবির অনেক দেশেই গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ব্যাংক গড়ে তোলা হয়েছে । যেমন, মালয়শিয়াতে আছে আমানাহ ইখতিয়ার । আরো নূতন নূতন দেশ এগিয়ে আসছে এই আদলে ব্যাংক গড়ে তুলবার জন্য ।

একজন বললো, তোমাদের দেশের দারিদ্রতার অবস্থা এখন কেমন ?

আমি বললাম,

আমরা এখনো গরিব তবে আগের থেকে অবস্থার উন্নতি হয়েছে । না খেয়ে থাকে, এ রকম লোক পাবে না বাংলাদেশে । এর প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশের কৃষকেরা বৈঙানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে শিখেছে ফলে খাদ্য ঘাটতি মিলিয়ে একটা ভারসাম্য চলে এসেছে । বলতে পারো বাংলাদেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ । খাদ্য সংস্থানের পাশাপাশি সরকারি এবং এনজিও সহায়তায় পল্লী অন্চলে স্কুল, মাতৃসদন ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে ফলে জীবন যাত্রার সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে গত বছর গুলোতে ।

একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো,

তাহলে কি আমরা ধরে নেবো বাংলাদেশ দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নের দিকে এগুচ্ছে ?

আমি হেসে বললাম,

আমি ঠিক তা বলি নি । বাংলাদেশ এখনো বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ । অনেক অভাবী লোক আজও চোখে পড়বে বাংলাদেশে তবে কথা হলো, মৌলিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র আর বাসস্থানের একটা হিল্লে কম বেশি সকলেরি হয়েছে । না খেয়ে কেউ কাটায় না । আর উন্নয়নের কথা যদি বলো, সেক্ষেত্রে অনেক ধনাত্মক পরিবর্তন এসছে গত দশ বছরে । ব্যবসা- বাণিজ্যের চাকা ঘুরছে জোরেশোরাই । শিল্পের প্রসার ঘটেছে, কর্মসংস্থান বেড়েছে । তবে দারিদ্র চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে ঠিক যতটুকু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরকার, তা এখনও অর্জিত হয় নি ।

- ঠিক কতটুকু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে তোমরা দারিদ্রের চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ?

আমি চুপ করে রইলাম কিছুক্ষণ তারপর বললাম, কোন ভাবেই সাত শতাংশের নিচে না, এর উপরে হলে ভালো ।

- এই সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি পেতে চাই অনেক পুঁজি । এই পুঁজির হদিস কোথায় পাবে ? এক মেয়ে জানতে চাইলো ।

আমি বললাম,

এই পুঁজির অভাবে দরিদ্র মানুষেরা যেমন ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে পারে না, তেমনি সমগ্র দেশ পুঁজির স্বল্পতায় একটা নির্দিষ্ট দারিদ্র চক্রে আটকে আছে । আমাদের দেশের মানুষের হাতে ওত পুঁজি নেই যা দিয়ে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি সম্ভব, তাই বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভর করতেই হচ্ছে । একটু ছাড় দিয়ে হলেও বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে হবে । বৈদেশিক বিনিয়োগ শুধু অর্থ নিয়ে আসে না, এর সাথে চলে আসে প্রযুক্তি আর উচ্চ ব্যবস্থাপনা ফলে দেশীয় লোকেরা অনেক কিছু শিখতে পারে বিদেশীদের কাছ থেকে । এই আসিয়ানদের কথাই ধরো না । বিদেশী পুঁজি আসিয়ানদের ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেছে ব্যাপক পরিসরে ।

কিছুক্ষণ নিরব থেকে আবার বলতে শুরু করলাম, বিদেশী পুঁজির পাশাপাশি আরেকটা কাজ করতে হবে আর তা হলো শিক্ষা খাতে বিপুল বিনিয়োগ । একমাত্র শিক্ষিত জনগোষ্টি পারে দেশকে আঁস্তাকুড় থেকে তুলে আনতে । আসিয়ানদের মধ্যে যারা শিক্ষা খাতে সব চেয়ে বেশি বরাদ্দ দিয়েছে, তারাই তাড়াতাড়ি এগিয়েছে । মালয়শিয়া হলো একটা উদাহরণ । শিক্ষা খাতে বিপুল বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশী পুঁজি এ দেশের ভাগ্যকে রাতারাতি পালটে দিয়েছে অথচ বিশ বছর আগে এরা ছিলো কৃষির উপর দাঁড়িয়ে ।

একজন দাঁড়িয়ে বললো,

শিক্ষা আর বিদেশী পুঁজির পাশাপাশি নিরবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আর মজবুত নেতৃত্ব মালয়শিয়াকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে শক্ত ভিতের উপরে । শিক্ষা খাতে ওদের বিনিয়োগ সত্যি অনেক ব্যাপক ।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম । দেখলাম অনেকেই মাথা নাড়ছে ।

একজন বললো, তোমাদের দেশের সমস্যাগুলো তোমরা চিহ্নিত করতে পেরেছো ?

আমি বললাম,

আমাদের সমস্যার শেষ নেই । রাজনীতিতে দুর্নীতি, ভালো ও শিক্ষিত মানুষদের রাজনীতিতে অনিহা, স্বল্প শিক্ষার হার, অল্পতে তুষ্টি, ভূমির তুলনায় অধিক জনসংখ্যা আমাদের খুবড়ে খুবড়ে খাচ্ছে ।

- অল্পতে তুষ্টি এর মানে কি ? এক মেয়ে পাশ থেকে বললো ।

আমি হেসে বললাম,

বাংলাদেশের পাড়া গায়ে গিয়ে দেখবে মানুষের চাহিদা খুব কম । আজ আর কালের খাবার যোগান থাকলে ওরা ঘরে বসে থাকে তারপর যখন খাবার ফুরিয়ে যায় তখন আবার কাজে নামে । কিন্তু এ মন মানসিকতায় জীবন যাত্রার মান পরিবর্তন করা যায় না । জীবন যাত্রার মান বাড়াতে প্রতিটি মানুষকে উচ্চাভিলাষি হতে হবে । নুতন নূতন কর্মের ক্ষেত্র খুঁজে বেড় করতে হবে তবেই ধনাত্মক প্রভাব পড়বে দেশের উপরে । এই উচ্চাভিলাষি হওয়া খারাপ কিছু নয় । তুমি সৎ উপায়ে গা-গতর খাটিয়ে টাকা আয় করবে, তাতে তুমি যেমন লাভবান হবে, তেমনি বেকার সমস্যার একটা হিল্লে হবে ।

তখন এক মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো,

আমার মনে হয় তোমার এই কথাটা সবচেয়ে বেশি খাটে Singapore এর জন্য । এই Singaporean রা খুব উচ্চাভিলাষি এবং সেই লক্ষ্যে রাত দিন খাটে ওরা । ফলে তৈরি হয়েছে নূতন নূতন কর্মক্ষেত্র আর উপায় । বিশ্ব মানের এয়ারলাইন্স, টেলি-কমিনিউকেশন, হেলথ এ্যান্ড এডুকেশন সার্ভিস ওরা গড়ে তুলেছে অথচ ত্রিশ বছর আগে ওরা ছিলো অনুন্নত সমুদ্র এলাকা । জীবন যাত্রার মান সুচকে Singapore আজ ইউরোপিও মানের তালিকায়, এই বলে মেয়েটা থেমে গেলো ।

তখন পাশ থেকে একজন সায় দিয়ে বললো,

এই উচ্চাভিলাষি মনোভাবের কারণে ঐ দেশের সামাজিক সূচকে কোন ঋনাত্মক প্রভাব পরেনি । সিঙাপুর হলো বিশ্বের অন্যতম দুর্নীতি মুক্ত দেশ । অফিস, আদালত ও পুলিশ ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি নেই বললেই চলে ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম । কিছু বললাম না ।

এক মেয়ে বললো, বাংলাদেশ কি এখনো কৃষির উপর দাঁড়িয়ে ?

আমি বললাম,

বাংলাদেশ এখনও কৃষির উপর দাঁড়িয়ে তবে অর্থনীতিতে কৃষির ভাগ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে এবং শিল্পের অবদান বাড়ছে । এইটে খারাপ কিছু নয় । অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কৃষির ভাগ

কমবে, এটাই স্বাভাবিক । উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখবে কৃষির অবদান অর্থনীতিতে পাঁচ ভাগেরও কম । কৃষি থেকে লাভ সামান্যই হয় তাই উন্নত দেশগুলো কৃষি থেকে বেরিয়ে ঙান নির্ভর অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে ।

একজন পাশ থেকে বললো, এই ঙান নির্ভর অথনীতিটা কি?

আমি একটু থেমে বলতে শুরু করলাম,

তিন ধরনের অর্থনীতি হতে পারে । কৃষি নির্ভর, শিল্প নির্ভর আর ঙান নির্ভর বা নলেজ ইকোনমি । পাশ্চাত্য বিশ্ব এখন সম্পূর্ণ ঙান নির্ভর । ঙান নির্ভর অর্থনীতিতে তৈরি হয় সব ঙান-সামগ্রী যেমন, সফটওয়ার, টেলিকমুনিকেশন ইত্যাদি । এই সব ঙান-সামগ্রী বেঁচে সবচেয়ে বেশি লাভ করা যায় তাই উন্নত দেশগুলো ঙান-সামগ্রী তৈরির সুবাদে বিশ্ব আয়ের আশি ভাগ নিজেদের ঘরে তুলে আনতে পেরেছে ।

কেউ একজন বললো, তাহলে আমরা কেন ঙান-সামগ্রী তৈরি করি না ?

আমি বললাম,

এই সব ঙান-সামগ্রী তৈরি করতে অনেক ঙান বা knowledge worker দরকার যা আমাদের নেই ফলে হয় আমরা কৃষি-সামগ্রী অথবা শিল্প দ্রব্য তৈরি করি যা থেকে মাঝারি আয় হয় । আসিয়ানদের মধ্যে একমাত্র সিঙাপুর ক্রমান্বয়ে নলেজ ইকোনোমির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কারণ ওদের আছে নলেজ ওয়ার্কার । সাধারণত inventor আর innovator দের নলেজ ওয়ার্কার বলা হয় ।

- দেশকে ঙান বা নলেজ ইকোনোমিতে রুপান্তরিত করতে কি কি করতে হবে ?

আমি চুপ হেয়ে গেলাম । তারপর বললাম,

এক কথায় বলতে গেলে, Information and Communication Technology দিয়ে দেশ মুড়ে ফেলতে হবে যেমন, ইন্টারনেট, মোবাইল, টেলিফোন ইত্যাদি । এই কাজটি করতে হবে যেন দেশের মানুষ সকল ধরনের তথ্য পেতে পারে । আজকের এই নলেজ জুগে তথ্যই হলো হাতিয়ার যা দিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে আনা যায় । এর পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বিপুল বিনিয়োগ, মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং, দেশের মানুষের মধ্যে ঙান-বিঙান চর্চ্চার উৎসাহ, দেশের মনিটারি, বিচার, নির্বাচন আর দুর্নীতি দমনের মতন ইন্সটিটিউশন গুলোকে স্বায়ত্ব শাসন দিতে হবে পুরোপুরি । এর পাশাপাশি চাই অবাধ তথ্য প্রবাহের সুযোগ । উন্নত দেশ বা ঙান নির্ভর দেশগুলোর দিকে তাকালে এই সব বৈশিষ্ট দেখতে পাবে ।

- আগামী দশকে বাংলাদেশ কেমন যাবে ?

- আমি তো সব রকমের আশা দেখি । কেন জানি মনে হয় আমরা দারিদ্র চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো ।

এক মেয়ে দাঁড়িয়ে বললো,

তোমরা চেষ্টা করতে পারো আসিয়ান পরিবারে সদস্য হবার । তাহলে স্বল্প শুল্কে আসিয়ান পরিবারে যে ব্যবসা বাণিজ্য চলে, তার সুফল ভোগ করতে পারবে ।

আমি হেসে বললাম, সে চেষ্টা আমাদের আছে । আসিয়ান পরিবারে ঢুকতে পারলে আমাদের লাভ বই কি ক্ষতি হবে না ।

পাশ থেকে একজন বললো, তোমার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কি ?

আমি হেসে দিলাম । প্লিজ একটু সময় দাও, আমি ভেবে নেই, এই বলে আমি চুপ হয়ে গেলাম । তারপর বললাম,

হ্যাঁ মনে পড়েছে । তোমরা তো জানো বাংলাদেশ নদী নালার দেশ, বর্ষাকালে প্রায়ই বন্যা হয় । ১৯৮৮ সালের বন্যা খুব ভয়াবহ হয়েছিলো । তখন আমি ঢাকায় থাকি । বন্যার কারণে নদীর পানি বাড়তে লাগলো । এক সময় সেই পানি শহরে এলো । তারপর কদিন যেতে না যেতে পানি উঠে এলো আমাদের ঘরে । উপায়ন্তর না দেখে আমরা দোতলায় উঠে গেলাম । নিচ তলায় ডুবে রইলো বন্যার পানিতে । কিন্তু সমস্যা সেখানেই ফুরুলো না । আমার মা গরু পালতেন, বাড়ির উঠোনে ওদের থাকবার জায়গা । সেখানেও পানি ঢুকলো ফলে গরু গুলোকেও দোতলায় তুলে আনা হলো তারপর গরু আর আমরা পাশাপাশি থাকতে শুরু করলাম ।

সবাই হেসে উঠলো । মেয়েরা বেশি করে হাসলো । আমিও হাসলাম ওদের সাথে । মনে এসে ভর করলো শিমলার কথা । ও থাকলে আমাদের এই আড্ডা উপভোগ করতে পারতো ।

দেখতে দেখতে এক ঘন্টা পার হয়ে গেলো । লাঞ্চ আওয়ার ঘনিয়ে এসেছে । একজন দাঁড়িয়ে বললো, তুমি নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছো আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে । এইটে আমাদের শেষ প্রশ্ন ।

- বেশ করো, আমি হাসি মুখে বললাম ।

- তোমার থাইল্যান্ডে কেমন লাগলো ?

আমি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

এ দেশের মহামানব গৌতম বুদ্ধের যে অহিংস নীতি আছে, সেইটে সবচেয়ে ভালো লেগেছে আমার । অহিংস দর্শনের মূলে যে লক্ষ্য লুক্কায়িত আছে, তা বিশ্বে শান্তি আনতে দেরি করবে না । এ এক পরম সত্য, পরম পছন্দনীয় জিনিষ ।

আমার কথা শুনে সবাই দাঁড়িয়ে গেলো তারপর হাততালি দিতে লাগলো । সবাই বলে উঠলো, তোমার যাত্রা শুভ হোক । আবার এসো, তোমার কথা আমাদের মনে থাকবে ।

তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমাকে উপহার দেয়া হলো । খুলে দেখি রামা নাইনের ছবি, কাসার ফ্রেমে বাঁধানো ।

|| ৯ ||

সকালের বৃষ্টি

আজ রবিবার, ছুটি ছাটা । সকাল থেকে ঝুর ঝুরে বৃষ্টি । ভালো করে লেপ কাথা চাপিয়ে নিয়েছি । কখন যে বেলা নটা ছুঁয়েছে, খেয়াল করিনি ।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো । ঘুমের মাঝে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছি । অলস হাতটা গিয়ে পড়লো ফোনের ক্রাডলে । ঘুম জড়িত কণ্ঠে বললাম, গুড মর্নিং । সাইদ বলছি ।

ওপার থেকে মিষ্টি কণ্ঠ । Good morning Sir, শিমলা বলছি ।

আমি উঠে বসলাম ।

- তোমাকে না কতদিন বলেছি আমাকে স্যার বলবে না, কেমন অস্বস্তি লাগে ।

- তুমি না চাইলেও পারছি না কারণ এখন official duty তে আছি আর তুমি আমাদের সম্মানিত অতিথি । হোটেলের বাইরে যত ইচ্ছে অনুরোধ কোরো ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

শিমলা বললো, তুমি নিশ্চয় সকালের নাস্তা করোনি ?

- না ।

-অসুবিধে না থাকে তো আমার অফিসে চলে আস । এক সাথে Breakfast সারি । কদিন পর তো চলেই যাচ্ছ ।

- আসছি, এই বলে ফোন রেখে দিলাম ।

শাওয়ার সেরে ইস্ত্রি করা পোশাক পড়ে নিয়েছি তারপর লিফট দিয়ে নিচে নেমে এলাম । চার তলায় শিমলার অফিস । মাঝারি সাইজের হলুদ প্লেটে লেখা,

Shimla Acharzo,
Exceutive Manager (Operational and Accounts).

অফিসের মুখে শিমলার সেক্রেটারি । আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো । বললো, সোজা চলে যাও । ম্যাডাম অপেক্ষা করছে ।

আমি হনহন করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম । ঘরটা যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া, সারা মেঝে জুড়ে নীল কার্পেট । স্তরে স্তরে কাঠের আলমারি । দরজার মুখে পাতা বাহারের গাছ, দক্ষিণের জানালা গলিয়ে সকালের আলো এসে পড়ছে সেই গাছে । তাকিয়ে দেখলাম ঝুর-ঝুরে বৃষ্টির ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে, ফর্সা হয়ে আসছে আকাশ । সূয্যি মামা কিছুক্ষণের মধ্যে ধরা দেবে ব্যাংককের আকাশে ।

শিমলা তার প্রসস্ত টেবিল ছেড়ে উঠে এলো । প্লিজ বসো, এই বলে হালকা করে হাসলো মেয়েটা । পাশেই সোফা সাজানো আছে । আমি এলিয়ে বসলাম ।

শিমলা বললো, কেমন আছো ?

- ভালো ।

- আমি মনে হয় তোমার সকালের ঘুমটা মাটি করে দিলাম ?

আমি হেসে বললাম, কোন থাই সুন্দরীর সাথে সকালের Breakfast করবো, সে তো হাজার ঘুমের চেয়ে উত্তম ।

শিমলা হেসে দিলো । আমি তাকিয়ে দেখলাম, শিশিরে শিশিরে ভরে গেল ঘরটা ।

দেখতে দেখতে Breakfast চলে এসেছে । দুই মাঝ-বয়সি মেয়ে ট্রেতে Breakfast নিয়ে হাজির । একে একে সেগুলো রাখা হলো টেবিলের উপর ।

শিমলা বললো, তোমাদের ধন্যবাদ, কিছু লাগলে জানাবো । তোমরা চাইলে যেতে পারো ।

- ধন্যবাদ ম্যাডাম, এই বলে মেয়ে দুইটা চলে গেলো ।

শিমলা একটা প্লেটে আমার খাবার বাড়তে লাগলো ।

আমি বললাম, আর দিও না । একদম খেতে পারবো না ।

- ঠিক আছে । এটুকুন তো খাবে ?

- তাও পারবো না ম্যাডাম ।

শিমলা কিছুটা নামিয়ে প্লেটটা বাড়িয়ে দিলো ।

খেতে বসেছি দুজন । তাকিয়ে দেখলাম শিমলার প্লেটের এক কোণায় এক স্লাইস ব্রেড পড়ে আছে, সাথে হালকা মাখন ।

আমি বললাম, তুমি তো কিছুই নাওনি ?

- আমি এটুকুই খাই । এর বেশি চাইলেও খেতে পারবো না ।

- এ টুকুন খেয়ে সারাদিন অফিস করতে পারবে ?

- আমার অভ্যেস আছে ।

আমি হেসে দিলাম, কিছু বললাম না ।

শিমলা বললো, হাসিবের ছবি দেখবে ?

- দেখাও ।

ড্রয়ের থেকে ছবি বের করে আনলো শিমলা । বললো, হাসিবকে তোমার কথা বলেছি E-mail এ । সে তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ।

- আমার শুভেচ্ছা পৌছে দিও হাসিবকে ।

- এই দেখো হাসিব আখতার আর এইটে ওর wife । বউটা কি সুন্দরী, তাই না ?

আমি হেসে বললাম, নিশ্চয় সুন্দরী তবে সুকুমভিট রোডের শিমলা আচার্যের চেয়ে এক ধাপ পিছিয়ে ।

শিমলা সে দিকে না গিয়ে বললো, এই দেখো ওদের দুই বছরের মেয়ে ।

- বাহ, মেয়েটা তো খুব সুন্দর ।

- ইয়েস খুব সুন্দর । হাসিবের ইচ্ছে মেয়েকে টিচার বানাবে । দেখেছো হাসিব কেমন মুটিয়ে গেছে । বউয়ের যত্ন-আত্মি পেয়ে শরীরে মেদ এসেছে । কেমন যেন আলসেটে ভাব ওর চেহারায় । কৈ তুমি তো নিচ্ছ না, সাইদ ?

- এই তো নিচ্ছি, এই বলে ব্রেড তুলে নিলাম ।

শিমলা বললো, তোমার তো যাবার দিন ঘনিয়ে এলো ।

- হু আর মাত্র এক সপ্তাহ তারপর রামাদের দেশ ছাড়ছি ।

- না ছাড়লেই পারো । এখানে তো চাকরির অভাব নেই ।

- Chulalongkorn University গতকাল আফার দিয়েছে তিন বছরের জন্য । ইচ্ছে হলে থেকে যাওয়া যায় । এখনো তো রামাদের জানা হলো না । - তাহলে থেকে যাও, শিমলা তাড়া দিয়ে বললো ।

আমি বললাম,

এই রামাদের আদি-উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কর্মকান্ড নিয়ে বড় ধরনের গবেষণার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু তা মনে হয় হলো না । বর্তমান রাজা রামা নাইন নিয়ে তোমাদের অবস্থান কি ?

শিমলা বলতে শুরু করলো,

রামা নাইন একজন শিক্ষিত রাজা সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সময়ের রাজা । দেশের কোন গুরুত্বপুর্ণ সমস্যায় তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন । নিজের গাট থেকে টাকা খরচ করে গরিব থাইদের জন্য । এ দেশে রামা নাইন খুব জনপ্রিয় । রাজা পাশ দিয়ে গেলে সবাই মাথা ঝুঁকিয়ে বসে পড়ে । গৌতম বুদ্ধের পরেই রামা নাইনের স্থান ।

- তাহলে তো দেখছি এ এক ইলাহি কান্ড । আফসোস, এই রামাদের খালি চোখে দেখা হলো না ।

- তোমাদের দেশে রাজা বাদশাহ নেই ?

- আগে ছিলো, অনেক আগে । এখন ও সবের বালাই নেই ।

- তোমাদের মালয়শিয়াতে ?

- হ্যাঁ আছে । রাজা আছেন তবে ওখানকার রাজার ব্যাপারটা একদমি অন্য রকম ।

- সেটা কি রকম ?

আমি বলতে শুরু করলাম,

মালয়শিয়াতে রাজার ছেলে রাজা হয় না । ওদেশের সুলতানেরা পালাক্রমে রাজা হয় । অনেকগুলো স্টেটস নিয়ে মালয়শিয়া । সেই স্টেটসে একজন করে সুলতান থাকেন ওরাই পালাক্রমে রাজা হয় । সাংবিধানিক ভাবে রাজার ক্ষমতা নেই বললেই চলে তবে রাজা কোন অনুরোধ করলে সেটা মেনে চলা হয় । সারা দেশের মানুষ রাজাকে সম্মান করে । তোমাদের দেশের রামা নাইন যেমন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে না, মালয়শিয়ার রাজারাও তাই ।

শিমলা বললো,

তাহলে তো মালয়শিয়ায় রাজা হবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা । থাইল্যান্ডে রাজ পরিবারের বাইরে কেউ রাজা হবে, তা ভাবাই যায় না । বাঁধাছাঁদা করে ফেলেছো ?

- বলতে পারো এক রকম শেষ । শুধু একটা সুটকেস কিনবো । সব আঁটাতে পারছি না ।

- তুমি তো চলে যাচ্ছ । যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও ।

- ঠিক আছে বলো ।

- তোমার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে যা সবার আগে চোখে পড়বে ।

- সেটা কি রকম ?

- সত্যি সত্যি শুনতে চাও ?

- হু শুনতে চাই ।

- কেউ যখন কথা বলে, তুমি মন দিয়ে কথাটা শোনো তারপর ভালো করে বুঝে জবাবটা দাও । যতবার আমি কথা বলেছি, তুমি মন দিয়ে শুনেছো তারপর উত্তরটা দিয়েছো ।

আমি বললাম, তাহলে তো দেখছি আমি একজন ভালো Listener ।

- ঠিক তাই, এই বলে আমার গ্লাসে পানি ঢেলে দিলো শিমলা । বললো, থাই সমাজে ধীর স্থির মানুষের কদর আছে কারণ বৌদ্ধ দর্শনে বার বার Tolerance এর কথা বলা হয়েছে । তুমি খেয়াল করলে দেখবে এ দেশের Monk রা তাদের Tolerance বাড়ানোর জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেন । যার যতো Tolerance, সে তত ত্বরিত নির্বাণের দিকে এগিয়ে যাবে ।

- তাহলে কি আমি নির্বাণের দিকে এগিয়ে চলেছি ?

শিমলা হেসে দিলো । অনেকক্ষণ ধরে হাসলো মেয়েটা । হাসি থামিয়ে বললো, তোমাকে আরও এক কাপ কফি দেবো ?

- ঠিক আছে দাও ।

শিমলা উঠে গেলো । অনেক সময় নিয়ে কফি বানালো । হালকা ধুঁয়া উঁড়ছে, ক্যাফিনের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারিপাশে ।

আমি বললাম, বাংলাদেশের কবিদের নিয়ে তো অনেক গল্প বললে । এবার এ দেশের কবিদের গল্প বলো ।

- এ দেশের কবিদের গল্প ?

- হু, বলে আমি মাথা নাড়ালাম ।

- কি ধরনের গল্প শুনতে চাও ?

- তোমার যে রকম ইচ্ছে ।

- ঠিক আছে বলছি । ওর নাম লা-সাও । ক্ষেতখোলা, অমাবস্যা আর অন্ধকার রাত্রি নিয়ে কবিতা লেখে এই লা-সাও । তেমন পরিচিতি নেই । আন্চলিক পত্রিকায় দুই একটা কবিতা ছাপা হয়েছে । ইশান প্রদেশে বাড়ি । কৃষি হলো প্রধান জীবিকা ইশান বাসীদের ।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো,

লা-সাও এক মেয়েকে ভালোবাসতো কিন্তু কখনো মুখ ফুটে বলেনি । সেই মেয়েটার নাম অনুসা । কবির পাড়াতেই থাকতো অনুসা । এক সাথে সকুলে যাওয়া আর সন্ধ্যে হলে বিলের পাড়ে বসা থাকা, এ ছিলো ওদের নিত্য দিনের কাজ । তারপর ওরা বড় হলো, কলেজে ঢুকলো । অনুসারা খুব গরিব ছিলো তাই অনুসাকে বিয়ে দিয়ে দেয় ওর বাবা, এই বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো ।

আমি বললাম, তারপর কি হলো ?

- দাঁড়াও, এয়ারকনটা কমিয়ে আসি । তোমার মনে হয় শীত করছে, থেকে থেকে কেঁপে উঠছো ।

আমি হেসে বললাম, তাহলে তো খুব ভালো হয় কিন্তু তোমার তো অসুবিধে হলো না ?

শিমলা অল্প করে হাসলো । বললো, মেয়েদের অত কিছু ধরতে নেই । তোমরা ভালো থাকলেই আমরা খুশি ।

আমি কিছু বললাম না ।

এয়ারকুলার কমিয়ে এসে বসলো শিমলা । বলতে লাগলো,

- অনুসার বিয়ে হলে গেলো । অনুসাকে নিজের কথা বলতে পাড়লো না লা-সাও । দারিদ্রতা এসে বার বার বাধা দিলো লা-সাও কে । স্কুল পড়ুয়া ভাই বোনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো কবি । এভাবে বিশ বছর কেটে গেলো । অনুসার কথা ভেবে লা-সাও আর বিয়ে করেনি । একা একাই জীবন কাটাতে লাগলো । একদিন খোঁজ এলো অনুসার দুরারোগ্য অসুখ হয়েছে, সপ্তাহ খানেকের বেশি বাঁচবে না । লা-সাও আর দেরি করলো না । অনুসাকে দেখতে রওনা হলো । ঠিক করলো ওকে সব খুলে বলবে, এখন তো মরেই যাবে ।

- অনুসার বাড়িতে পৌছালো লা-সাও । গিয়ে দেখলো অনুসা শুকিয়ে কাঠ । মাথার চুল আলুথালু । পরলোকের ছায়া পড়েছে অনুসার চোখে-মুখে । ছেলে বেলার বন্ধু লা-সাও কে পেয়ে অনুসা খুশি হলো ।

লা-সাও বললো, তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি ?

অনুসা হেসে বললো, বলো ।

লা-সাও বলতে গিয়ে থেমে গেলো । গলা আটকে এলো ওর তারপর অনুসার হাতে একটা চিঠি বাড়িয়ে দিলো ।

- এই চিঠিতে আমার কথা বলা আছে । তুমি পড়ে নিও, এই বলে লা-সাও বাড়ি ফিরে এলো ।

- তুমি জানতে চাও ঐ চিঠিতে কি লেখা ছিলো ?

- নিশ্চয় জানতে চাই, আমি তাড়া দিয়ে বললাম ।

> প্রিয় অনুসা,
>
> আজ বিশ বছর ধরে তোমাকে যে কথা বলতে চেয়েছি, তা আজ লিখে জানাচ্ছি । আমি কখনো তোমাকে ভুলতে পারি নি । সেই ছেলেবেলায় তুমি যেমন ছিলে, আজও তেমনি আছ । দুঃখ একটাই আর তা হলো এই খবরটা বিশ বছর পরে দিতে হচ্ছে । এটাই নিয়তি । ভালো থেকো । ইতি লা-সাও ।

চিঠিটা বলে শিমলা চুপ হয়ে গেলো । কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে মেয়েটা ।

আমি বললাম, তারপর কি হলো ?

- তারপর ? তারপর লা-সাও বাড়ি ফিরে এলো । কিছুদিন যেতেই ডাক যোগে একটা চিঠি পেলো লা-সাও । চিঠিটা খুলে দেখলো অনুসার চিঠি । বড় বড় হরফে লিখেছে ।

> প্রিয় লা-সাও,
>
> আমাকে কেনো আগে বলো নি ? তোমার মতন আমিও যে একি কথা বিশ বছর ধরে লালন করে ফিরছি কিন্তু আফসোস জীবনের পড়ন্ত বেলায় আমাকে শুনতে হলো । এখন খুব বাঁচতে ইচ্ছে করছে । কেন বললে না তুমি ? তোমার অনুসা ।

এই চিঠিটা পড়ে লা-সাও আবার রওনা হলো অনুসার বাড়িতে । গিয়ে দেখলো বাসায় কেউ নেই । পাশের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়লো লা-সাও । এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলো ।

সালাম দিয়ে লা-সাও বললো, অনুসাদের বাড়িতে কাউকে দেখছি না ?

- ওরা cemetery তে গেছে ।

- কেনো ?

- আজ সকালেই অনুসা মারা গেলো । ওকে নিয়ে ওরা cemetery তে গেছে, তুমি হয়তো গেলে পাবে ।

লা-সাও কিছু বললো না । ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো । হাঁটা দিলো বাড়ির দিকে, ইশান প্রদেশে ।

গল্পটা শেষ হয়েছে কিছুক্ষণ হলো কিন্তু তার রেশ এখনো ছড়িয়ে আছে । দুজনেই চুপ হয়ে বসে আছি, সারা ঘরে নেমে এলো নিস্তব্ধতা ।

আমি বললাম, লা-সাও কি এখনো বেঁচে আছে ?

- আছে তবে বুড়িয়ে গেছে । ইশান প্রদেশে গেলে দেখতে পাবে ।

আমি বললাম, এখনো কবিতা লেখে ?

- হ্যাঁ লেখে, ওর কবিতা পড়লে তুমি চোখের পানি রাখতে পারবে না ।

আমি কিছু বললাম না, চুপ হয়ে গেলাম । খেয়াল করে দেখলাম আমার চোখের কোণ ভিজে উঠেছে ।

একটু পরে সোফা ছেড়ে উঠে গেলো শিমলা । বললো, একটু বসো । এখনি আসছি ।

শিমলা উঠে গিয়ে একটা ফোন করলো । থাই ভাষায় কি যেন বললো । তারপর ফিরে এসে বললো,

> আবার কুড়ি বছর পরে তার সাথে দেখা হয় যদি
> আবার বছর কুড়ি পরে-
> হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
> কার্তিকের মাসে ....
> জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার,
> তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার ।

আমি বললাম, জীবনানন্দের কবিতা বললে ?

- হু । দেখেছো জীবনানন্দের সাথে লা সাওয়ের জীবন কেমন মিলে গেছে ?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, কিছু বললাম না ।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শিমলা বললো,

আমাদের এই তিন মাস ভাল কাটলো সাইদ । তুমি চলে গেলে জীবনানন্দকে নিয়ে কথা বলার সংগী হারিয়ে ফেলবো । তুমি ছিলে, অনেক কথা জানা গেছে । আমিও অনেক কথা বলেছি । তোমাকে এত কথা কেন বললাম সেটাই ভাবছি ।

আমি বললাম, দেখো, আবার আসবো ।

শিমলা হাসলো, কিছু বললো না ।

।। ১০ ।।

আবারও সুবর্ণভুমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট

সকাল তিনটায় প্লেন ছেড়ে যাবে । তার মানে আজ রাত তিনটে । পুরো ব্যাংকক জুড়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে । যেদিন থাইল্যান্ডে আসি, সেদিন এমনি ঝুর ঝুরে বৃষ্টি ঝরছিলো ।

দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল । এখন ফিরবার পালা । তেমন কিছু কিনিনি । শিমলার উপহার দেয়া এক সেট সার্ট আর ধূসর রঙের টাই যোগ হয়েছে আমার লাট বহরে । এর সাথে কিছু গিফট । অবশ্য নূতন একটা স্যুটকেস কিনেছি হাজার বাথ দিয়ে । বেশ সুন্দর, চারিদিকটা ধূসর । হাতলটা কালো রঙের । দূর থেকে মনে হয় একটা মাটির ডিবি উঁচু হয়ে আছে ।

মালয়শিয়াতে আমার বাড়ির আশেপাশে অনেক ছেলেপুলে থাকে । অবসর দিনগুলোতে ওদের নিয়ে কাটাই । মাঝেসাঝে ওদের ডেকে কার্টুন আর কমিকস দেখি । খুব খুশি হয় ওরা । ওদের জন্য চকলেট কিনতে নিয়ে কিনলাম না । ভাবলাম ওদের বাবা মার কাছে Permission নিয়ে চকলেট কিনে দেবো ।

রাত একটায় রিপোর্টিং । ঠিক ঠিক প্লেন উড়লে দুই ঘন্টায় কুয়ালালুমপুর পৌছানো যাবে । সুবেহ-সাদিকে প্লেনটা গিয়ে নামবে কুয়ালালুমপুর ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে । এয়ারপোর্টে একাই যেতে চেয়েছিলাম । শিমলা রাজী হলো না, ও পৌছে দেবে । রাত বারটায় আসবে শিমলা । সুকুমভিট রোড থেকে এক ঘন্টা লাগবে এয়ারপোর্টে পৌছাতে ।

বারোটা বাজতে চলেছে । একটু পরেই শিমলার টেলিফোন পাবো তারপর নিচে নেমে যাবো । ব্যাংকক ছেড়ে যাচ্ছি, ভাবতে মনটা দুলে উঠলো ।

সম্পূর্ণ কাকতলীয় ভাবে শিমলার সাথে পরিচয় তারপর ঘুরে বেড়ানো । সুকুমভিট রোড থেকে শুরু করে প্রাতুনাম । রাতের বেলায় রেসতোরায় ডিনার করা তারপর হাঁটতে হাঁটতে পার্কে বসা । আলো আঁধারির বেঞ্চে বসে জীবনানন্দের কবিতা শোনা । হাজারো নক্ষত্রে ভর করে চাও ফ্রেয়া নদীতে ঘুরে বেড়ানো । অহিংস মানব গৌতমের দর্শন নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা । মনে হয় কত বছরের চেনা মেয়েটা ।

ঠিক বারোটায় ফোন বেজে উঠলো । ফোন তুলতেই শিমলার গলা । নেমে আসো সাইদ । আমি হোটেলের বারান্দায় অপেক্ষা করছি ।

গাড়ি ছেড়ে দিলো, নূতন মডেলের টয়োটা । নিঃশব্দে হাইওয়েতে উঠে এলো । এক ঘন্টা লাগবে তারপর ঠিক ঠিক পৌঁছে যাবে সুবর্ণভুমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে । এই এয়ারপোর্টটা নূতন বানিয়েছে থাইরা । আসিয়ানের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এয়ারপোর্ট ।

শিমলা আজ ড্রাইভার আনেনি । নিজেই চালিয়ে এসেছে । আজ আর অফিসের ড্রেস পড়েনি । ট্র্যাডিশনাল থাই ড্রেস পড়েছে ও । মাথার চুল শক্ত করে বাধা, কানের লতিতে ঝুলে আছে ডায়মন্ডের রিং । হাইওয়ে রাস্তায় নিয়নের আলো পড়তেই জ্বল জ্বল করে উঠলো রিং দুটো ।

একটু পরে শিমলার হ্যান্ডফোন ফোন বেজে উঠলো । শিমলা কথা বলছে থাই ভাষায় । আমার দিকে তাকিয়ে বললো,

- মা কথা বলবে তোমার সাথে ।

আমি ফোনটা তুলে নিলাম ।

- ওপার থেকে মেয়েলি কন্ঠ ভেসে এলো, সাইদ, আবার এসো । আমরা তোমাকে মিস করবো ।

আমি বললাম, নিশ্চয় । আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন ।

কোন উত্তর এলো না । বুঝলাম উনি প্রার্থনা করছেন ।

কিছুক্ষণ পরে বললো, হ্যাঁ । আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি ।

- ধন্যবাদ ।

- ভালো থেকো, শুভ রাত্রি । Safe Journey ।

হাইওয়ে মাড়িয়ে গাড়িটা ছুটে চলেছে । দুই ধারে রাস্তা, ঘাট, দোকান ত্বরিত সরে যাচ্ছে । মাঝে মধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা এসে পড়ছে গাড়ির উইন্ডশিলে । কেমন শীত শীত করতে লাগলো আমার ।

শিমলা বললো, কদিন থেকে গেলে হতো না সাইদ ?

- সামনের সপ্তাহে সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি । এখন না গেলে গুছিয়ে উঠতে পারবো না ।

শিমলা বললো,

ভেবেছিলাম তোমাকে নিয়ে পাতেয়া বিচ দেখতে যাবো । ব্যাংকক থেকে ঘন্টা খানেক লাগে । দিনে গিয়ে দিনে ফিরবো । তোমার প্রিয় সমুদ্র তোমাকে দেখিয়ে আনতাম ।

- এর পরের বার হবে শিমলা । আমি তো আবার আসছি ।

- তুমি কি আর কখনো আসবে ?

আমি চুপ হয়ে গেলাম, কিছু বললাম না । মিথ্যা কোন Promise করতে ভয় হলো কারণ সামনের সপ্তাহে সুইজারল্যান্ড যাচ্ছি দুই বছরের জন্য ।

- তুমি না হয় সুইজারল্যান্ডে ঘুরে যাও । তখন তুমি আমার মেহমান ।

আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো শিমলা । কিছু বলতে নিয়ে থেমে গেলো ।

দেখতে দেখতে এয়ারপোর্ট চলে এসেছে । মালপত্র গুছিয়ে নেমে এলাম । সোজা কাউন্টার বরাবর হাঁটা দিয়েছি । কাউন্টারে এসে দেখলাম সব ঠিক আছে । প্লেন ঠিক সময়ে উড়ে যাবে ।

কাউন্টারে একটা মেয়ে বসে আছে । থাই মেয়ে, লাল রংয়ের ইউনিফরম, আমাকে দেখে বললো, তোমার পাসপোর্ট আর টিকেট গুলো দাও ।

আমি বের করে দিলাম ।

মেয়েটা অনেকক্ষণ কম্পিউটারে টেপাটেপি করে বললো,

এই নাও তোমার বোর্ডিং কার্ড । ঠিক তিনটায় প্লেন ছেড়ে যাবে । ঐ ডান দিকে ইমিগ্রেশন । ইমিগ্রেশন করে সোজা চলে যাবে । একটু হাঁটলেই দেখবে সি-টু গেট, ওখানে আমাদের এয়ারক্র্যাফট দাঁড়িয়ে আছে । আর কিছু জানতে চাও ?

আমি বললাম, না ।

মেয়েটা হেসে বললো, তোমাকে ধন্যবাদ আমাদের সেবা নেবার জন্য ।

- তোমাকেও ধন্যবাদ ।

মেয়েটা হেসে দিলো, মিষ্টি হাসি ।

কাউন্টার থেকে বেরিয়ে দেখি শিমলা এক কোণায় বসে আছে । আমি কাছে যেতেই উঠে দাঁড়ালো ।

আমি বললাম, প্লেন ঠিক সময়ে ছেড়ে যাবে । আমাকে ওরা ইমিগ্রেশনে যেতে বলছে ।

শিমলা কিছু বললো না, চুপ করে রইলো ।

আমি বললাম,

তুমি আর এই হিমের মধ্যে থেকো না । রাত অনেক হলো তার উপর সকালে তোমার অফিস । তুমি বরন্চ চলে যাও ।

- না । আরো একটু থাকি সাইদ ।

আমি বললাম,

আমি তো এখনি ভেতরে ঢুকে পড়বো আর বেরুতে পারবো না । তুমি এই হিমের মধ্যে নাই বা বসলে ।

শিমলা মাথা নেড়ে সায় দিলো । তুলে নিলো হাতের ব্যাগটা ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শিমলার গাড়ির কাছে এলাম । আমি গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি ।

শিমলা বললো, আবার এসো সাইদ ।

আমি হেসে দিলাম । তাকিয়ে দেখলাম শিমলার চোখে কয়েক বিন্দু পানি জমে আছে । বীপরিত দিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট পড়তেই সে গুলো জ্বল জ্বল করে উঠলো ।

শিমলা গাড়ি ছেড়ে দিলো । আস্তে আস্তে পেছনের লাল বাতি ছোট হয়ে এলো, এক সময় মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে ।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম স্থির হয়ে তারপর হাঁটা দিলাম ইমিগ্রেশনের দিকে । যন্ত্র চালিতো সিড়িতে চড়ে বসেছি । মনে এসে ভর করলো শিমলার কথা, এক ভিনদেশী মেয়ের কথা যার সারা অন্তর জুড়ে বাংলাদেশের এক কবি ছায়া ফেলে রেখেছে । যার অস্থি মজ্জায় গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতি নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে । । ধর্ম, বর্ণ জাতি সকল কিছুর উর্দ্ধে উঠে যে কিনা মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছে । সে হলো এ দেশেরই এক মেয়ে, শিমলা । শিমলা আচার্য ।

ইমিগ্রেশনের কাছে এসে থমকে দাড়ালাম । কি জানি মনে হলো আর ভেতরে ঢুকলাম না । সোজা চলে এলাম এয়ারলাইন্সের কাউন্টারে । বললাম, একটা জরুরি কাজে হঠাৎ আটকে গেছি । আমি যেতে পারছি না । এখন কি করবো বলো ?

মেয়েটা হেসে বললো,

তোমার লাগেজ এয়ারক্র্যাফটে চলে গেছে । এখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না । তবে তুমি যখন মালয়শিয়ায় যাবে, তখন আমাদের অফিস থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারবে । এই বলে মেয়েটা কি যেন আলাপ করলো পাশের এক লোকের সাথে তারপর বললো,

আধা ঘন্টার মতন অপেক্ষা করো । আমি কুপন বানিয়ে দিচ্ছি, এই বলে মেয়েটা চলে গেলো । আমি পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম ।

ঠিক ঠিক আধা ঘন্টা পরে মেয়েটা ফিরে এলো । হেসে বললো, এই নাও তোমার কুপন ।

- ধন্যবাদ ।

মেয়েটা হেসে বললো, তোমাকেও ধন্যবাদ । আশা করছি কদিন পর আবার দেখা হবে ।

আমি কুপনটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম । ডিপারচার করিডরে আসতেই শুনলাম পেছন থেকে কে যেনো ডাকছে । ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম শিমলা, শিমলা আচার্য । আমার থেকে চার হাত দুরে দাঁড়িয়ে আছে ।

আমি বললাম, তুমি যাও নি ?

- গিয়েছিলাম । বাড়ির কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসেছি ।

- কেনো ?

- আমার মনে হচ্ছিলো তুমি যাবে না তাই নিতে এলাম ।

আমি হেসে বললাম, কেন গেলাম না তা জানতে চাইবে না ?

- না তার দরকার নেই । এসো আমার সাথে ।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে এলাম । আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে গাড়ির পেছনে ভরলো শিমলা ।

- উঠে পড়ো সাইদ ।

উঠে এলাম গাড়িতে । গাড়ি ছেড়ে দিলো । ধীরে ধীরে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছে গাড়িটা । । তাকিয়ে দেখলাম শিমলার চোখে জমে যাওয়া পানি এখনো ঝুলে আছে । নিয়নের আলোতে সেগুলো জ্বল জ্বল করে উঠলো ।

আমি বললাম, তুমি কাঁদছো কেনো ?

- হ্যাঁ কাঁদছি । আমাকে কাঁদতে দাও, বাধা দিও না । আজ আমি প্রাণ খুলে কাঁদবো ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, চুপ হয়ে বসে রইলাম । আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম শিমলা কেঁদে চলেছে ।

দেখতে দেখতে গাড়িটা হাইওয়েতে উঠে এলো তারপর ছুটে চললো সামনের দিকে । ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলাম রাত দুটো । বৃষ্টি থেমে গেছে কিছুক্ষণ হলো, পরিস্কার হয়ে উঠেছে আকাশ । আকাশে আজ ভরা পূর্ণিমা, সেই আলোতে থিক থিক করছে চারিপাশ । আমার মনে হলো এই মাত্র বুঝি অহিংস মানব গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হলো আর তার ছটায় আলোয় আলোয় ভরে উঠেছে চারিপাশ ।

শেষ

Please comment about the book at ; sayed.hossain@yahoo.com

Please visit my website: www.sayedhossain.com

May 15, 2009